বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের বীজ অন্বেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. ফিল্. উপাধি প্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক : বরুণ পরামাণ্য

ক্রমিক সংখ্যা – ০০১৭০১২০৩০১৬

পরীক্ষা রোল নং- MPSA194014

রেজি. নং – ১৪২৩৪৫ (২০১৭ - ২০১৮)

শিক্ষাবর্ষ – ২০১৭ – ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ অশোক কুমার মাহাত

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৯

DECLARATION

Certified that the thesis entitled, **"বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের বীজ অন্বেষণ"**, submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy(Arts) in Sanskrit of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me in part or in whole for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work is being carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertstion has also been presented by me at a seminar at Jadavpur university, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation(2017) of Jadavpur University

.....

(Name/or signature of the M.Phil Student

with Roll number and Registration number)

On the basis of academic merit satisfying all the criteria declared above the dissertation work of Barun Paramanya, entitled **"বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের বীজ অন্বেষণ"** is now ready for submission towards the partial fulfilling of the the Degree of Master of Philosophy(Arts) in Sanskrit of Jadavpur University.

....

Head Supervisor & convener of RAC Member of RAC

(Department of Sanskrit)

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the dissertation entitled "বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের বীজ অন্বেষণ" submitted by Barun Paramanya (Roll No. MPSA 194014 of 2017-2019, Registration No. 142345 of 2017-2018) for M. Phil. Degree in Sanskrit, Jadavpur University, has been prepared under my supervision during the session 2017-2019. I consider it fit for the degree of Master of Philosophy (Arts) in Sanskrit of Jadavpur University.

Supervisor:

Date:

Head of the Department:

Date:

I do hereby declare that the dissertation entitled **“বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের বীজ অন্বেষণ”** submitted by me for the award of Master of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my own work carried out under the supervision of Dr. Ashok Kumar Mahata and neither this dissertation nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Date:

Candidate

Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণাসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক মাননীয় ডঃ অশোক কুমার মাহাত মহাশয়কে। বহু ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে নিবন্ধ রচনার প্রতিটি পদক্ষেপে ঐকান্তিক সহযোগিতা করেছেন, বিভিন্ন সময়ে তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন এবং উৎসাহিতও করেছেন। তাঁর স্নেহ ও আশীর্বাদ শিরোধার্য করেই আমি এই গবেষণা সন্দর্ভটি উপস্থাপিত করার সাহস পেয়েছি। তাঁর অমূল্য উৎসাহ, দিগ্‌নির্দেশনা ও আন্তরিক সহায়তা ব্যতীত আমার মতো নিতান্ত অর্বাচীনের পক্ষে এহেন গবেষণাসন্দর্ভ রচনা করা মূলতঃ দুঃসাধ্য ও অসম্ভব ছিল। তাই সর্বাগ্রে তাঁর পাদপদ্মে আমার একান্ত ভক্তি-সাহচর্যপূর্বক প্রণাম নিবেদন করি।

আরও বলতে কার্পণ্য করব না, যে তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনের দিন আমি খুবই স্নায়ুচাপে পীড়িত ছিলাম। কারণ অপর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মতো আমিও ওই দিন আমার স্যারের কাছে গবেষণা-সন্দর্ভের কাজে আদৌ সুযোগ পাব কি না, এ বিষয়ে অনিশ্চিত ছিলাম। শেষে চরম নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করার অন্তিম মুহূর্তে স্যার যখন আমার নামটি উচ্চারণ করলেন, তখন যে কী বিরল আনন্দ অনুভূত হয়েছিল, তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

অকুণ্ঠচিত্তে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই, আমার বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ পিয়ালী প্রহরাজ মহাশয়া, মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ দেবার্চনা সরকার মহাশয়া, মাননীয় অধ্যাপক ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাননীয় অধ্যাপক ডঃ দেবদাস মণ্ডল মহাশয়, মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ কাকলী ঘোষ মহাশয়া, মাননীয়া অধ্যাপিকা ডঃ শিউলি বসু মহাশয়া এবং

মাননীয় অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় মণ্ডল মহাশয়কে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্মান জানাই। তাঁদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর থেকে তাঁদের অধ্যাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে অনেক সু-মতামত পেয়েছি। এক কথায়, তাঁরাই আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ গবেষণার প্রকৃত বীজ বপন করেছেন। সেদিক থেকে তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের মনোগ্রাহী শিক্ষণ-পদ্ধতি যে কোনও পর্যায়ের শিক্ষা-পিপাসু ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দুর্লভ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে ও বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই আমার ভূতপূর্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ তারকনাথ অধিকারী মহাশয়কে। বর্তমানেও তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। গবেষণা করার প্রেরণা আসলে তিনিই আমাকে সরবরাহ করেছিলেন। অতীতে বহুবার এমনকি বর্তমানেও নানা বিষয়ে মতাদর্শ নিতে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি ও এখনও যাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার উৎসাহ তিনিই জুগিয়েছিলেন। একারণে তাঁর কাছে আমি চিরঋণী। আর সাধুবাদ জানাই আমার স্কুল জীবনের ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সকল শিক্ষক–শিক্ষিকাকে যাঁরা আমাকে উল্লিখিত বিষয়ে নানাভাবে উন্নতির পথে প্ররোচিত করেছেন।

এই গবেষণা-সন্দর্ভ রচনার জন্য যে সমস্ত গ্রন্থাগারের পর্যাপ্ত সাহায্য নিয়েছি, সেই সকল গ্রন্থাগার-সমূহের কর্মীগণকে জানাই কৃতজ্ঞতা। বিশেষতঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক মাননীয়া শ্রুতি মল্লিক ও মাননীয় গ্রন্থাগার-কর্মী নিমাই সর্দারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

বিনীত

বরুণ পরামাণ্য

সূচীপত্রঃ-

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা.....	1-11
দ্বিতীয় অধ্যায় : বেদে মহাভারতের পটভূমি	12-28
তৃতীয় অধ্যায় : দশরাজার সংগ্রাম ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ : তুলনাত্মক সমীক্ষা..	29-35
চতুর্থ অধ্যায় : বেদে মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রের মূল অনুসন্ধান.....	36-74
পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার.....	75-81
গ্রন্থপঞ্জী.....	82-84

সংকেতসূচী

অ. সং. – অথর্ববেদসংহিতা।

ঋ. সং. – ঋগ্বেদসংহিতা।

ঐ. ব্রা. – ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

কা. সং. - কাঠক সংহিতা।

ছা. উ. – ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

জৈ. ন্যা. বি. – জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর।

জৈ. সূ. – জৈমিনীয়সূত্র।

তৈ. আ. – তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

তৈ. সং. – তৈত্তিরীয় সংহিতা।

নি. - নিরুক্ত।

পা. - পাণিনিপ্রণীত অষ্টাধ্যায়ী।

ভবি. পু. – ভবিষ্যপুরাণ।

ভা. পু. – ভাগবতপুরাণ।

ভা. বৈ. যু. – ভারত-ইতিহাসে বৈদিকযুগ।

ম. সং. – মনুসংহিতা।

মহা. অশ্ব. – মহাভারত অশ্বমেধপর্ব।

মহা. আদি. – মহাভারত আদিপর্ব।

মহা. আশ্র. - মহাভারত আশ্রমবাসিক পর্ব।

মহা. উ. – মহাভারত উদ্যোগপর্ব।

মহা. ক. – মহাভারত কর্ণপর্ব।

মহা. ভী. - মহাভারত ভীষ্ম পর্ব।

মহা. শা. - মহাভারত শান্তিপর্ব।

মহা. সৌ. – মহাভারত সৌপ্তিকপর্ব।

মহা. স্ত্রী. - মহাভারত স্ত্রী পর্ব।

মহা. স্বর্গা. - মহাভারত স্বর্গারোহণপর্ব।

যা. সং. – যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

বৃ. দে. – বৃহদ্দেবতা।

শ. ব্রা. - শতপথ ব্রাহ্মণ।

সা. ঋ. ভা. - সায়ণাচার্যকৃত ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা।

সাং. সূ. – সাংখ্যসূত্র।

EEI - Exploring Early India

PHAI - Political History of Ancient India

……..

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বিশ্বসাহিত্যের সর্বপ্রাচীন মহাগ্রন্থ বেদ এবং পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাকাব্য মহাভারত ভারতবর্ষের দুটি সর্বোৎকৃষ্ট ও মহামূল্যবান সম্পদ। ভারতীয় সভ্যতা, জনজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্তে এই দুই গ্রন্থের স্থান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী এই দুই গ্রন্থের মধ্যে বেদকে শ্রুতি ও মহাভারতকে স্মৃতি বলে গণ্য করা হয়। দার্শনিক বিচারে বেদ অপৌরুষেয় ও মহাভারত পৌরুষেয়। সুতরাং বেদের কোন রচয়িতা নেই, তবে ঐতিহ্য অনুসারে মহর্ষি ব্যাসদেব এ গ্রন্থের সংকলক এবং তিনিই মহাভারত সহ অন্যান্য বহু গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর নাম অনুসারে মহাভারতকে বৈয়াসিক মহাভারত নামে অভিহিত করা হয়। সমগ্র বেদকে চারভাগে বিভক্ত করার জন্যে তিনি ব্যাস নামে খ্যাতি লাভ করেন। পুরাবৃত্ত অনুসারে পরাশর–সত্যবতীর পুত্র তিনি। জন্মের পর গায়ের রঙ কালো হওয়ার জন্যে তাঁর নাম রাখা হয় কৃষ্ণ। দ্বীপে জন্ম হয়েছিল বলে দ্বৈপায়ন নামেও তিনি খ্যাত হয়েছিলেন। সব মিলিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। সুতরাং বেদ ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থের সঙ্গে ব্যাসদেবের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

।। বেদের প্রামাণ্য ।।

বেদের বিশেষত্ব সাধারণত আমাদের যে জ্ঞান হয় তা কখনও প্রত্যক্ষের দ্বারা কখনও বা অনুমানের দ্বারা। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের জগতে প্রত্যক্ষজনিত বা অনুমানজনিত জ্ঞান ছাড়াও আরও জ্ঞান আছে। সেগুলির জনক হল বেদ। তাই বেদের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষজনিত বা অনুমানজনিত জ্ঞান থেকে অতিরিক্ত। আর ঠিক সেই কারণেই বেদের বেদত্ব, বেদের অসাধারণত্ব, অর্থাৎ বেদজনিত জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা বা অনুমানের দ্বারা লাভ করা যায় না। তাই প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান আমরা

লাভ করতে পারি না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে জানা যায় বলে বেদ নামের যাথার্থ্য অনুভব করতে পারি। বেদশব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে সায়ণাচার্য ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায় উদ্ধৃত করেছেন -

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বিদ্যতে।

এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।[1]

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভের উপায় জানা যায় না, সেই জ্ঞান বেদের দ্বারা জানা যায় বলে এই গ্রন্থ বেদ নামে অভিহিত হয়।

বেদ শব্দপ্রমাণ হিসাবে গণ্য। সাংখ্যদর্শনমতে বেদ যে শুধু প্রমাণ তা-ই নয়, বেদ হল স্বতঃ প্রমাণ।[2]

।। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ।।

ভারতীয় পরম্পরা অনুযায়ী বেদের কোন কর্তা বা স্রষ্টা নেই। বেদমন্ত্র পৌরুষেয় নয়, অর্থাৎ তা মানুষের দ্বারা রচিত নয়। অনাদিনিধনা নিত্যা বাক্ পরম ব্যোমে ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিই কেবল তাহা দর্শন করতে পারেন। যেহেতু কোন পুরুষের (অর্থাৎ মানুষের) দ্বারা রচিত নয় তাই তাকে অপৌরুষেয় বলা হয়ে থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়-

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদেতৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ।[3]

অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেরূপ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সেইরূপ ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ পরমেশ্বরের নিশ্বাসপ্রশ্বাস স্বরূপ।

জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তরে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়েছে।

---

[1] সা ঋ ভা।

[2] নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্। সাং সূ ৫।৫১

[3] বৃ আ উ

পৌরুষেয়ং ন বা বেদবাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।

কাঠাদিসমাখ্যানাদ্ বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ।।

সমাখ্যানং প্রবচনাদ্ বাক্যত্বং তু পরাহতম্।

তৎকর্ত্রনুপলম্ভেন স্যাত্ততোপৌরুষেয়তা।। [4]

অর্থাৎ বেদবাক্য পৌরুষেয় কি না- এই প্রশ্নের উত্তরে পূর্বপক্ষী মনে করেন, কাঠক প্রভৃতি ব্যক্তিনামানুসারী বেদশাখার নাম থেকে জানা যায় বেদ পৌরুষেয়, আবার অন্য মানুষের ব্যবহৃত বাক্যের মতো বেদবাক্যও বাক্যই- তাই তা পৌরুষেয়। কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষ মনে করেন, প্রবক্তার নাম অনুসারে কাঠকাদি বেদশাখার নামকরণ হয়েছে, সুতরাং বাক্য বলেই বেদ পৌরুষেয় এই যুক্তি খণ্ডিত হল, অতএব কর্তা না থাকার জন্যে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সাধিত হল।

।। বেদের নিত্যত্ব ।।

বেদ অপৌরুষেয় হওয়ার জন্যে তাকে নিত্য ও বলা হয়। যার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই তাই হল নিত্য। বেদের নিত্যত্বের কথা ঋগ্বেদ থেকেই শ্রুত হয়-

তস্মৈ নূনমভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া।

বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিম্।। [5]

অর্থ- হে বিরূপ, তুমি নিত্য বাক্য দ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি করো।

সায়ণাচার্যের মতে, উক্তং তু শব্দপূর্বত্বম্[6]- এই মীমাংসাসূত্র অনুযায়ী বেদের অনিত্যত্ব নিবারিত হয়। বেদরূপ শব্দ যে কঠপ্রভৃতি ব্যক্তির পূর্ববর্তী – এ কথা আচার্য জৈমিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি বেদের অনাদিত্ব বিষয়ে বলেছেন- ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন

[4] জৈ ন্যা বি ১।১।৮

[5] ঋ সং ৮।৭৫।৬

[6] জৈ সূ ১।১।২৯

সম্বন্ধঃ[7]। এখানে শব্দ ও অর্থ এবং তাঁদের উভয়ের সম্বন্ধের নিত্যত্ব প্রতিজ্ঞা করে শব্দাধিকরণ ও বাক্যাধিকরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

স্মৃতিবাক্য থেকেও বেদের প্রবাহ নিত্যতা কথিত হয়েছে।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।

লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভূবা।।[8]

।। ধর্ম : বেদে ও মহাভারতে।।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান আধার শ্রুতি। উত্তরকালে ভারতীয় মনীষীগণ স্মরণ করে যা রচনা করে গেছেন তাই তা স্মৃতি নামে কথিত। স্মৃতি বা ধর্মের মূল বিধৃত আছে বেদে। আর বেদই নিখিল ধর্মের উৎস। মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ উক্তি- বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্।[9] মনুসংহিতাকে বেদের সার সংগ্রহ বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ সমস্ত বেদার্থ এখানে নিহিত আছে।

মীমাংসা দর্শন অনুযায়ী ধর্মই হল বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। জৈমিনিসূত্রে ধর্মের লক্ষণ হল-

চোদনালক্ষণোর্থো ধর্মঃ।[10] অর্থাৎ চোদনাপ্রতিপাদ্য অর্থই ধর্ম। বেদানুমোদিত যাগযজ্ঞ ধর্ম বলে কথিত হয়ে থাকে। লৌগাক্ষিভাস্কর তাঁর অর্থসংগ্রহে বলেছেন- 'যাগাদিরেব ধর্মঃ। তল্লক্ষণং বেদপ্রতিপাদ্যঃ প্রয়োজনবদর্থো ধর্ম ইতি'। অর্থাৎ যাগযজ্ঞই ধর্ম। সেই ধর্মের লক্ষণ হল- বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত প্রয়োজনবিশিষ্ট কাঙ্ক্ষিত ফলই ধর্ম।

মহাভারতে ধর্ম শব্দের অর্থ দেখা যায়-

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

---

[7] জৈ সূ ১।১।৫

[8] মহা শান্তি ২১০।১৯

[9] ম সং ২।৬

[10] জৈ সূ ১।১।২

যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।। [11]

অর্থাৎ ধারণহেতু ধর্ম এই নামকরণ হয়, ধর্ম প্রজাদের ধারণ করে, যার দ্বারা প্রাণিগণের ধারণ হয়, তা-ই হল ধর্ম। আবার মহাভারতে বেদের ধর্ম বিষয়ে বলা হয়েছে-

শ্রুতের্ধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।

তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে।।

যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।। [12]

অর্থাৎ ধর্ম হল শ্রুতিমূলক এ কথা বহু ব্যক্তি বলে থাকেন। যা অহিংসাসংযুক্ত তা-ই হল নিশ্চিতরূপে ধর্ম। জীবগণের অহিংসার জন্যেই ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

মহাভারতের মূল বক্তব্যও ধর্মভিত্তিক। যেখানে ধর্ম সেখানে জয়- একথা মহাভারতে বার বার বলা হয়েছে-

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।[13]

।। বেদপাঠ ও কর্মানুষ্ঠানের অধিকার ।।

'স্বাধ্যায়োऽধ্যেতব্যঃ'[14] – এই হল বেদাধ্যয়নের বিধি। স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়নের জন্যে নির্দিষ্ট নিজ শাখার বেদ অধ্যয়ন করা উচিত। এই অধ্যয়ন কাম্যকর্ম নয়, বরং তা নিত্যকর্ম। বেদে দ্বিজাতিরই অধিকার। তবে বেদপাঠ ও বৈদিক কর্মানুষ্ঠানে সাধারণের অধিকার নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পুরুষ বেদে অধিকারী। নারী ও শূদ্রের বেদে অধিকার নেই। পতিত ব্রাহ্মণেরও অধিকার নেই। অর্থাৎ যখন নারী, শূদ্র ও

---

[11] মহা কর্ণ ৬৯।৫৯

[12] মহা কর্ণ ৬৯।৫৬, ৫৮

[13] মহা উ ৩৯।৯; ১৪৮।১৬; ভী ২১।১১; শল্য ৬৩।৬০; স্ত্রী ১৪।৯; ১৮।১৬

[14] তৈ আ ২।১৫

দ্বিজাচারশূন্য ব্রাহ্মণরা বেদপাঠে বঞ্চিত ছিল তখন মহাভারত গ্রন্থখানি তাদের কাছে ছিল বেদস্বরূপ। এই মনোভাব আধুনিক দৃষ্টিতে চূড়ান্ত সংকীর্ণতার পরিচায়ক। ভাগবতপুরাণে দেখা যায়-

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।

ইতি ভারতমাখ্যানং মুনিনা কৃপয়া কৃতম।।[15]

।। মহাভারতের ব্যাপকত্ব ।।

বিষয়বস্তুর গৌরবে এবং দর্শনের গভীরতায় মহাভারত আমাদের কাছে এক বিস্ময়কর আকরগ্রন্থ। মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলেছেন – যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।[16] অর্থাৎ যা এখানে আছে তা অন্যত্র আছে, আর যা এখানে নেই তা কোথাও নেই। এই কথার দ্বারা মহাভারতের ব্যাপকতা সহজেই অনুমিত হয়। এটি ভারতবর্ষের পরম্পরাগত ইতিহাস বলে কথিত। এর মধ্যে নিহিত আছে পুরাণের তাৎপর্য ও শাশ্বত আবেদন এবং এটি হল ভারতীয় সংস্কৃতির এক অসাধারণ চিত্রকল্প।

মহাভারত জয় নামেও প্রসিদ্ধ। মহাভারতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি হল-

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।

দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।[17]

সংস্কৃতির দৃষ্টি থেকে মহাভারতের সময় ভারতীয় সমাজ এক জটিল অবস্থায় পৌঁছেছিল। তৎকালীন সমাজে চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের প্রচলন থাকলেও বর্ণব্যবস্থা তত কঠোর ছিল না বলেই মনে হয়। মহাভারতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাজ এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের

---

[15] ভা পু ১।৪।২৫

[16] মহা, আদি ২।৩৯০

[17] মহা, আদি, অনুক্রমণিকাপর্ব

কাজ সহর্ষে করছেন। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য ধনুর্বিদ্যার সবচেয়ে বড় আচার্য ছিলেন। ভীষ্ম ক্ষত্রিয় এবং বিদুর শূদ্র মাতার সন্তান হয়েও হয়েও তত্ত্বোপদেশ প্রদানে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন।

।। মহাভারতের বেদপর্যায়ত্ব।।

ধর্মীয়বিধিনিষেধ অতিক্রম করে সর্বাধিকার প্রদান করেছিল মহাভারত। তাই মহাভারতকে পঞ্চমবেদ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই পঞ্চম বেদ আখ্যা লাভের প্রত্যাশায় নানা গ্রন্থের নাম যেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেমন- আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ নাট্যবেদ, ইতিহাসবেদ ইত্যাদি। মহাভারত ইতিহাস নামে আখ্যায়িত এবং এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। তবে অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় পঞ্চমবেদ হিসাবে মহাভারত অনেক এগিয়ে। এই পঞ্চমবেদে চতুর্বর্ণের অধিকার। অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয় এ গ্রন্থে ঘোষিত হয়েছে। ভবিষ্যপুরাণের উক্তি-

কার্ষ্ণং চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্।[18]

মহাভারত ইতিহাস নামে কথিত এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে তা পঞ্চম বেদ নামে উল্লিখিত-

ইতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।[19]

মহাভারত শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য। ব্রহ্মচর্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস – এই তিনটি আশ্রম যেমন গার্হস্থ্য আশ্রমকে অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই অন্য কোন কাব্য বিপুলতা ও উৎকর্ষ অতিক্রম করতে পারে না।

অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে।

বিশেষেণ গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ।।[20]

---

[18] ভবি পু

[19] ছা উ ৭।১।২

[20] মহা, আদি ১।৭৪

মহাভারত শুধু মহাকাব্য নয়, এ মহাগ্রন্থ নিজেই নিজেকে ইতিহাস ও পুরাণ নামে অভিহিত করেছে। ইতিহাস–পুরাণরূপে সমগ্র মহাভারতের কাহিনি ভারতীয় জনমানসে অসামান্য অবদান রেখেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির গরিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ আদর্শ, সামগ্রিক যুগচেতনার ইতিহাস, প্রাচীন রীতিনীতি, আচার–ব্যবহারের যথার্থ ধারণা এই মহাগ্রন্থ থেকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।

ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ।।[21]

ইতিহাসপুরাণানামুন্মেষং নির্মিতং চ যৎ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ ত্রিবিধং কালসংজ্ঞিতম্।।[22]

।। মহাভারতের বেদপরিপূরকত্ব।।

মহাভারতে ইতিহাস ও পুরাণের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে যে এই দুই শাস্ত্রের দ্বারা বেদার্থকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে, কারণ বেদ অল্পবিদ্বান ব্যক্তিকে ভয় পান এই ভেবে যে পাছে তিনি প্রহার করেন।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

বিভেত্যল্পশ্রুতত্বাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।। [23]

তাৎপর্য হল- ইতিহাস-পুরাণকে বেদের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই তার পঞ্চম বেদ এই আখ্যাটি যথার্থ হবে।

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন মহাভারতকথা বর্ণনা করেন। লোমহর্ষণ নামক সুতের পুত্র উগ্রস্রবা সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে পুনরায় তা বর্ণনা করেন। শৌনক

---

[21] মহা০ আদি ১।৫৪

[22] মহা, আদি ১।৬৩

[23] মহা, আদি ১।২৬৯

ঋগ্বেদের অনুক্রমণী গ্রন্থে ঋষি ছন্দ ও দেবতার নাম লিপিবদ্ধ করেন। শব্দসংখ্যা ১৫৩,৮২৬ অক্ষরসংখ্যা ৪৩২০০০।

।। বেদ ও মহাভারতের তুলনা।।

ভারতীয় ঐতিহ্যে বেদের স্থান সর্বোচ্চ। পরম্পরাগত ভারতীয় ধারণায় বেদ শ্রুতি এবং তা অপৌরুষেয়। মহাভারত বেদানুসারী, বেদের অনুগত। তার কাছে বেদের পূজ্যত্ব প্রশ্নাতীত। তবু বেদের শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ভরতবংশীয়দের বৃহৎ এই জীবনকথা। মহত্ত্বে ও গুরুত্বে মহাভারত অন্য বহু গ্রন্থের তুলনায় অগ্রবর্তী। ভারতীয়দের জীবনে বেদ ও মহাভারত গভীরতম অবস্থান চিরন্তন।

।। মহাভারতের নামগৌরব।।

মহাভারত হল চতুর্বেদের অর্থবাহী। তাই এই গ্রন্থপাঠে বেদপাঠের ফলই লাভ হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া এ গ্রন্থপাঠের অন্য তাৎপর্যও আছে। মহাভারতের কথক সৌতির সঙ্গে সংলাপকালে মুনিগণ তাঁকে একথাই বলেন।

বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।

সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্।। [24]

এই গ্রন্থ রচনার ফলে বেদব্যাসের কার্য আশ্চর্যজনকরূপে প্রতিভাত হয়েছে, এই গ্রন্থে চারটি বেদের অর্থই উপলব্ধ হয় এবং এটি পবিত্রতাকারক এবং পাপভয়নাশক। সুতরাং আমরা সেই মহাভারত শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

[24] মহা, আদি ১।২১

।। মহাভারতের নামকরণ।।

বিষয়বস্তুর গুরুত্বে এবং আয়তনের বিশালতায় মহাভারত গ্রন্থখানিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা হয়। মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যায়- প্রাচীনকালে দেবতারা সকলে একত্র হয়ে তুলাদণ্ডের একদিকে সরহস্য চতুর্বেদ এবং অন্যদিকে মহাভারতকে স্থাপিত করে ভার পরিমাপ করেছিলেন। এই মাপ গ্রহণের ফলে দেখা গিয়েছিল মহত্ত্বে এবং গুরুত্বের বিচারে মহাভারতই বেদকে অতিক্রম করেছে।

এই দুই বিচারে মহাভারত বেদের তুলনায় অধিক হওয়ার জন্যেই লোকে এই মহাগ্রন্থকে মহাভারত নামে অভিহিত করেছে।

পুরা কিল সুরৈঃ সর্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।

চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।।

তদা প্রভৃতি লোকেস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।

মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোধিকম্।

মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।। [25]

মহাভারতের নামকরণের অন্যরূপ যুক্তিও দেখা যায়। বেদোক্ত ভরত নামক জাতির নাম অনুসারে তাঁদের বংশনাম এবং এই দেশের নাম হয় ভারত। আবার প্রাচীন রাজা দুষ্যন্তের পুত্র ছিলেন ভরত। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশি ছিল যে পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এই দেশের নাম হয় ভারত। ভরতবংশীয় রাজাদের কাহিনির নামও ভারত। এই কাহিনি ভারতীয় জনমানসে মহান বলে গণ্য হয়, সেজন্যে ভরতবংশীয় রাজগণের মহান জন্মকথা মহাভারত আখ্যালাভ করে। মহাভারত গ্রন্থটিতে এই রাজবংশের কাহিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মহাভারতই নিজের নামকরণের যাথার্থ্য ঘোষণা করেছে এই ভাবে- ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মাদ্ভারতমুচ্যতে। [26]

---

[25] মহা, আদি ১।২৭২, ২৭৩

[26] মহা, স্বর্গা ৫।৪৫

ভারতীয় সভ্যতা, জনজীবন, ধর্ম, সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। শুধু ভারত নয়, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম একটি মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এটি। ভারতীয় পরম্পরানুযায়ী মহাভারতকে স্মৃতিও বলা হয়। ঐতিহ্য অনুসারে মহর্ষি ব্যাসদেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই কারণে একে বৈয়াসিক মহাভারতও বলে। ভরতবংশের সামগ্রিক ইতিহাসের কাহিনী এবং সেই সঙ্গে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনাও মহাভারতের বিষয়বস্তু। রচনাশৈলী ও কাহিনির বিচারে মহাভারত একদিকে ইতিহাস ও পুরাণ। বিশ্বের মানবসমাজ একদা যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল তখন মহাভারত তার উৎকৃষ্ট জ্ঞানরাশি ভারতবাসীর জীবনে সঞ্চার করে অজ্ঞান বিদূরিত করে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করেছে। মহাভারত সূর্যের মতো ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ – এই চতুর্বর্গের কথা ব্যক্ত করে সকল মানবলোকের অন্ধকার দূর করেছে। সুতরাং মহাভারত হল পূর্ণিমা রাতের আকাশে পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ। চাঁদ যেমন রাত্রিকালীন পৃথিবীকে তমসামুক্ত করে, তদ্রূপ এই গ্রন্থ জ্ঞানালোকের মাধ্যমে শ্রুতিরূপ জ্যোৎস্নার বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। সুদূর অবস্থান থেকে এই গ্রন্থ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে তার আলোকবর্তিকার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সমাজের এমন কোনও স্তর নেই যেখানে পৌঁছায়নি। সুতরাং প্রতিটি ভারতীয়র জীবনে আলোকপ্রদীপ স্বরূপ এই মহাভারতের যে অবদান তা একেবারেই অতিরঞ্জিত নয়, বরং তা যথার্থ বাস্তব সত্য।

.....

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদে মহাভারতের পটভূমি

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদে মহাভারতের পটভূমি

কালানুক্রমে বেদ যে শুধু মহাভারতের পূর্ববর্তী তা নয়, ভারত তথা বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীনতম সাহিত্য হল বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য যথেষ্ট কাব্যগুণসম্পন্ন এবং তাকে পরবর্তী কালের মহাকাব্যের উৎস বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বেদ মহাকাব্যের উপজীব্য কি না সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে।

আচার্য শৌনক তাঁর বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে মন্ত্রের নানাবিধ শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এদের মধ্যে সংবাদসূক্ত আখ্যানসূক্ত দানস্তুতি নারাশংসী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর সূক্তগুলি এবং অথর্ববেদের কুন্তাপসূক্তকে মহাকাব্যের বীজ বলে মনে করা যেতে পারে। ম্যাক্স মুলার (Freidrich Max Muller), সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Levi) প্রমুখ মনীষী ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলিকে এক ধরণের নাটক বলে মনে করেন। হার্টেল (Hertel), শ্রোয়েডার (Schroeder), ম্যাকডোনেল (Arthur Anthony Macdonnel) প্রমুখ ভারততত্ত্ববিদ এই মতবাদকে সমর্থন করেছেন। Hertel মহাভারতকে নাট্যকাব্য (dramatic poetry) বলে মনে করেছেন। সুতরাং এই শ্রেণীর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলি হল পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকের উৎস বা বীজ। তবে ওলডেনবার্গ (Hermann Oldenberg) এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি মনে করতেন প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকারের রচনা বিদ্যমান ছিল। ওই ধরণের সাহিত্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি পদ্যে এবং ঘটনার বিবরণগুলি গদ্যে লেখা হত। শুধু

ভারতীয় সাহিত্যেই নয় ইউরোপের প্রাচীন সাহিত্যেও এই রীতি অনুসরণ করা হত। পরবর্তী কালে সাহিত্যের এই পদ্যাংশ রক্ষিত হয় কিন্তু গদ্যাংশ লুপ্ত হয়ে পড়ে। তাই ভারতীয় সাহিত্যের ঋগ্বেদ বা সামবেদে কোনও গদ্যাংশ দেখা যায় না। তবে অন্য দেশের সাহিত্যে কিছু গদ্য সংরক্ষিত হয়। Max Muller প্রভৃতি পণ্ডিতগণ Oldenberg-এর এই মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এবং তাঁর সমর্থকেরা সংবাদসূক্তগুলিকে নাট্যসাহিত্যের উৎস বলেই প্রতিপন্ন করেছেন। ভিন্টারনিৎস (Moriz Winternitz) এই বিরুদ্ধবাদী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন যে এই সংবাদসূক্তগুলি প্রাচীন ব্যালাডের সমগোত্রীয় এবং এরা মহাকাব্য এবং নাটক উভয়েরই বীজ বলে গণ্য হতে পারে। কারণ ব্যালাডগুলি বর্ণনা এবং নাটকলক্ষণ উভয় বৈশিষ্ট্যই বহন করে। তবে তাঁর মতে আখ্যানগুলি, যাদের Oldenberg অনুমান করেছেন, সেগুলি যে ওই সাহিত্যের মূল অংশ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। এ ছাড়া এই ব্যালাড কাব্যে মহাকাব্যের পূর্ণাঙ্গ লক্ষণ দেখা যায় না। আবার নাটকেরও সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য এতে সুলভ নয়।

বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সংবাদসূক্তগুলিকে নাটক ও মহাকাব্য এই উভয় সাহিত্যের বীজ বা উৎস হিসাবেই ধরতে পারি। কারণ মহাভারত নামক মহাগ্রন্থটি আধুনিক দৃষ্টিতে বাহ্য ব্যাপারে নাটক এবং আভ্যন্তর বিষয়ে কাব্য বলে পরিগণিত। ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তগুলিকে পরবর্তী মহাকাব্যের উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমরা মনে করি।

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলে মহাভারতের ঘটনা, চরিত্র ও স্থানের নাম উল্লিখিত। ঐতিহ্য অনুসারে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। কিন্তু আধুনিক বিচারে এই গ্রন্থে এমন কিছু ঘটনা চরিত্র ও স্থানের নাম দেখি যেগুলিতে স্পষ্টতই মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য

বর্তমান। তবে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি আদৌ বেদে উল্লিখিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে বিচার অবশ্যই করণীয়।

মহাকাব্য হিসাবে দেখা হলে মহাভারতের একটি বিশাল মূল কাহিনি আছে। সেই কাহিনির সঙ্গে যুক্ত আছে নানা উপাখ্যান। নানা প্রসঙ্গে সেই উপাখ্যানগুলি মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত। তারা মূল কাহিনির ধারাবাহিকতাকে ঘন ঘন ব্যাহত করেছে এ কথা সত্য। কিন্তু তাদের কখনই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। মহাভারতে যে রাজবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে তাঁদের নানা নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। যথা- পুরুবংশ, ভরতবংশ, কুরুবংশ । তাই তাঁরা কখনও পৌরব, কখনও ভারত, আবার কখনও কৌরব নামে অভিহিত হয়েছেন। পাণ্ডববংশও কৌরবদের অংশ। আসলে সেই বংশের এক এক জন বিখ্যাত রাজার নাম অনুসারে সেই বংশের নামকরণ হয়ে থাকে। একই বংশের ভিন্ন ভিন্নকালীন রাজার নাম অনুসারে বিভিন্ন সময়ে সেই বংশ চিহ্নিত হওয়ায় এই নামকরণের ভিন্নতা দেখা যায়।

তবে মহাভারত এই নামকরণে গ্রন্থের কথাবস্তু ভরতবংশের কাহিনি বলেই গণ্য হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র রাজবংশের কাহিনিকে দু ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। এক- প্রাচীন রাজাদের কাহিনি এবং দুই শান্তনু থেকে আরম্ভ করে অশ্বমেধদত্ত পর্যন্ত রাজগণের কাহিনি। দ্বিতীয় অংশটি মহাভারতে বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়। বর্তমান অধ্যায়ে প্রাচীন রাজাদের কাহিনি এবং সেই সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে তাঁদের উল্লেখ যতটুকু পাওয়া যায় তার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। মহাভারতের এই প্রথম পর্যায়ের কাহিনিকে আমরা মূল পর্যায়ের পটভূমি হিসাবে দেখার চেষ্টা করেছি।

বলা বাহুল্য, বেদে মহাভারতের সম্পূর্ণ কাহিনি পাওয়া যায় না। তবে মহাভারতে বর্ণিত রাজবংশের রাজাদের অনেকের কথা বেদে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। সকল রাজার কথা বৈদিক সাহিত্যে নেই। যে সমস্ত রাজার কথা মহাভারতে আছে, বেদে প্রাপ্ত সেই রাজার বিবরণ ও তুলনা করে তাঁরা আসলে একই ব্যক্তি কি না সেই প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে । এই অনুসন্ধানে সর্ব ক্ষেত্রে সাফল্য দাবি করা যায় না, বরং বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট বিষয়টি উপস্থাপনই লক্ষ্য বলে মনে করা যেতে পারে। প্রথমে মহাভারতে বর্ণিত রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা উপস্থাপন করে তাঁদের বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মহাভারতে কথিত রাজবংশের কুলপঞ্জিকা

১) নারায়ণ ২) ব্রহ্মা ৩) মরীচি ৪) কশ্যপ ৫) বিবস্বান্ ৬) মনু ৭) **ইলা ৮)** পুরূরবা ৯) আয়ু ১০) নহুষ ১১) **যযাতি ১২) পুরু ১৩)** জনমেজয় ১৪) প্রাচীন্বান ১৫) সংযাতি ১৬) অহংযাতি ১৭) সার্বভৌম ১৮) জয়ৎসেন ১৯) অবাচীন ২০) অরিহ ২১) মহাভৌম ২২) অযুতানায়ী ২৩) অক্রোধন ২৪) দেবাতিথি ২৫) অরিহ ২৬) ঋক্ষ ২৭) মতিনার ২৮) তংসু ২৯) ঈলিন ৩০) দুষ্মন্ত ৩১) **ভরত ৩২)** ভূমন্যু ৩৩) সুহোত্র ৩৪) হস্তী ৩৫) বিকুণ্ঠণ ৩৬) অজমীঢ ৩৭) সম্বরণ **৩৮) কুরু ৩৯)** বিদূরথ ৪০) অনশ্বা ৪১) পরিক্ষিৎ ৪২) ভীমসেন ৪৩) প্রতিশ্রবা ৪৪) প্রতীপ ৪৫) **শান্তনু ৪৬) বিচিত্রবীর্য ৪৭)** পাণ্ডু ৪৮) অর্জুন ৪৯) অভিমন্যু ৫০) **পরিক্ষিৎ ৫১) জনমেজয় ৫২)** শতানীক ৫৩) অশ্বমেধদত্ত।

বিবস্বান্ ও মনু

বিবস্বানের পুত্র মনুর কথা ঋগ্বেদ থেকে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে গয় ঋষির নামাঙ্কিত সূক্তে দেখা যায়-

পরাবতো যে দিধিষন্ত আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ।

যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধি ব্রুবন্তু নঃ।। [27]

অর্থাৎ যে সকল দেবতা অতি দূর দেশ থেকে এসে মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, যাঁরা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদের অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের আশ্রয় দান করেন, যাঁরা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হন, তাঁরা আমাদের মঙ্গল করুন।

মহাভারতের পাণ্ডবগণের কুলপঞ্জিকায় কশ্যপপুত্র বিবস্বান্ এবং বিবস্বানের পুত্র মনু। ঋগ্বেদীয় কুলপঞ্জিকা মহাভারতের কুলপঞ্জিকার অনুরূপ।

ইলা

ঋগ্বেদে ইলা একজন পৃথিবীবাচক স্ত্রীদেবতা। [28] এই ইলার সঙ্গে পুরূরবার মাতাপিতা ইলার সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। । নিরুক্তেও তাঁকে স্ত্রীদেবতা হিসাবে বলা হয়েছে। [29]

---

[27] ঋ সং ১০।৬৩।১

[28] ঋ সং ১০।১১০।৮।

[29] নি০ ৭।৮।১

ঋগ্বেদের একস্থলে তিনি উর্বশীর সঙ্গে একীভূতা[30]। নিরুক্তে তিনি সকলেরই মাতৃস্বরূপা। [31]স্কন্দস্বামীর মতে উর্বশী শব্দ ইলার বিশেষণ।

বৃহদ্দেবতায়ও তিনি স্ত্রীদেবতা। [32]

কুলপঞ্জিকায় বিবস্বানের পুত্র মনুর বেণ, ধৃষ্ট, নাভাক প্রভৃতি দশ সন্তানের মধ্যে ইলা হলেন অন্যতম। ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ বলে তিনি পরিচিত। ইলার পুত্র হলেন পুরূরবা। তিনি পুরূরবার একাধারে পিতা ও মাতা উভয়েই।

পুরূরবা

পুরূরবার (এবং সেই সঙ্গে উর্বশীরও) বৃত্তান্ত পাওয়া যায় ঋগ্বেদের উর্বশী পুরূরবা সংবাদসূক্তে[33]। এই সূক্তের আঠারোটি মন্ত্রে উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন বিধৃত আছে। মর্ত্যের রাজা পুরূরবা এবং স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হন। তাঁরা চার বছর দাম্পত্য অতিবাহিত করার পর উর্বশী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন এবং তিনি হঠাৎ পুরূরবার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তখন পুরূরবা উর্বশীর সন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন এবং অবশেষে উর্বশী সঙ্গিনীদের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় পুরূরবার দৃষ্টিগোচর হন। তখন উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার যে কথোপকথন হয় তা ঋগ্বেদের বর্ণনা থাকে জানা যায়।

---

[30] ঋ সং ৫।৪১।১৯,২০

[31] নি ১১।৪৯।২

[32] বৃ দে ১।১১২, ১২৬; ৩।১৩; ৮।১২৬

[33] ঋ সং ১০।৯৫

উর্বশীকে ফিরে পাওয়ার জন্যে পুরূরবা আকুল প্রার্থনা জানান। তিনি বলেন-

হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।

ন নৌ মন্ত্রা অনুদিতাস এতে ময়স্করণ্ পরতরে চনাহন্।।[34]

অর্থাৎ হে নিষ্ঠুর প্রিয়তমে, অনুকূল মন নিয়ে ক্ষণকাল অবস্থান করো। এখনই আমরা পারস্পরিক বাক্যালাপ করতে চাই। আমাদের মনে কথাগুলি না বলতে পারলে ভবিষ্যতে সুখ হবে না।

উর্বশীর মন তাতে গলল না। তিনি সংকল্পে অনমনীয় পুরূরবাকে গৃহে ফিরে যেতে বলেন। পুরূরবা উর্বশীহীন জীবনের চাইতে মৃত্যু কামনা করলেন । তখন উর্বশী পুরূরবাকে বলেন-

পুরূরবো মা মৃথা মা প্র পপ্তো মা ত্বা বৃকাসো অশিবাস উ ক্ষন্।

ন বৈ স্ত্রৈণানি সখ্যানি সন্তি সালাবৃকাণাং হৃদয়ায়েতা। [35]

হে পুরূরবা, তুমি মৃত্যুকামনা করো না, উচ্ছন্নে যেও না। তোমায় যেন বৃকেরা ভক্ষণ না করে। স্ত্রীজাতির সঙ্গে পুরুষের স্থায়ী বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব নয়, তাঁদের হৃদয় শালাবৃকের হৃদয়ের মতো নিষ্ঠুর ও কঠোর।

ঋগ্বেদের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। [36] পুরূরবাকে যেন বিবস্ত্র অবস্থায় না দেখেন এই শর্তে উর্বশী তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

---

[34] ঋ সং ১০।৯৫।১

[35] ঋ সং ১০।৯৫।১৫

[36] শ ব্রা ১১।৫।১

স্বর্গবাসী গন্ধর্বগণ উর্বশীকে নিজেদের মধ্যে ফিরে পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন। তাই তাঁরা চক্রান্ত করে একদা রাত্রিকালে উর্বশীর পালিত মেষশাবক অপহরণ করলেন। তখন তস্করদের পশ্চাদ্ধাবনকারী নগ্ন পুরূরবার রূপ উর্বশীর দৃষ্টিগোচর হয়। শর্তভঙ্গ হওয়ার ফলে উর্বশী পুরূরবাকে পরিত্যাগ করে অন্তর্হিত হন।

বৈদিক সাহিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে উর্বশী-পুরূরবার প্রণয়-কাহিনি বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, কথাসরিৎসাগরেও বিস্তৃতিলাভ করে। উর্বশী-পুরূরবার সম্বন্ধের কথা বৃহদ্দেবতায় দেখা যায়।[37]

পুরূরবা শব্দের নির্বচন নিরুক্তে দেখা যায় এইভাবে- পুরূরবা রোরূয়তে। [38]অর্থাৎ পুরূরবা বহুপ্রকার শব্দ বার বার করে থাকেন। পুরু শব্দের উত্তর শব্দার্থক রু ধাতু থেকে পুরূরবা শব্দ নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। পুরূরবা মেঘধ্বনিরূপ শব্দ উৎপন্ন করেন তাই পুরূরবা এইরূপ নামকরণ।

মহাভারতে পুরূরবা হলেন ইলার পুত্র। তাই তাঁকে ঐল পুরূরবা নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন মনুষ্যকলেবর অর্থাৎ আকৃতিতে মানুষ কিন্তু সর্বদা দেবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বৃহদ্দেবতায় পুরূরবার ইন্দ্রের সম্বন্ধের কথা জানা যায়। [39] পরবর্তীকালে তেরোটি দ্বীপের অধীশ্বর পুরূরবা বীর বিক্রমে ব্রাহ্মণদের সাথে যুদ্ধ করে তাঁদের ধনরাশি অপহরণ নেন। সেই কারণে ক্রুদ্ধ ঋষিগণের অভিশাপে অবশেষে এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহাপরাক্রমশালী রাজার বিনাশ ঘটে।

---

[37] বৃ দে ২।৫৯; ৭।১৪৭-১৫২

[38] নি ১০।৪৬।৩

[39] বৃ দে ১।১২৪

পুরূরবা গন্ধর্বলোক থেকে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয় এবং উর্বশীকে আনেন। যথাকালে পুরূরবা ও উর্বশীর আয়ু প্রভৃতি ছয় পুত্রের জন্ম হয়। আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষ ছিলেন ক্ষমতাশীল রাজা। রাজধর্মানুসারে তিনি পৃথিবী পালন করেছিলেন। তাঁর মতো প্রতাপশালী ও মহাপরাক্রমী রাজা দুর্লভ। তিনি পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলকেই পালন করেন। এই বিক্রমশালী রাজার ছয় পুত্রের মধ্যে যযাতি ছিলেন অন্যতম।

যযাতি

যযাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মহাভারতের কুলপঞ্জির মতো সেখানেও তিনি নহুষের পুত্র। শুধু তাই নয়, তাঁদের পূর্বপুরুষ বিবস্বানের পুত্র মনুর কথাও একই উৎস থেকে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে গয় ঋষির নামাঙ্কিত সূক্তে দেখা যায়-

পরাবতো যে দিধিষন্ত আপ্যং মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ।

যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধি ব্রুবন্তু নঃ।। [40]

অর্থাৎ যে সকল দেবতা অতি দূর দেশ থেকে এসে মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, যাঁরা বিবস্বানের পুত্র মনুর সন্তানদের অতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের আশ্রয় দান করেন, যাঁরা নহুষপুত্র যযাতির যজ্ঞে অধিষ্ঠান হন, তাঁরা আমাদের মঙ্গল করুন।

[40] ঋ সং ১০।৬৩।১

মহাভারতের বিবরণ অনুসারে যযাতি রাজা হয়ে নিজ বিক্রমে তিনি পৃথিবী শাসন করেন। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি তিনি। তিনি বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন, পিতৃগণকে ও দেবগণকে পুজা করতেন এবং সুষ্ঠুভাবে প্রজাদের শাসন করতেন। তাঁর দুই পত্নী দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা। দেবযানীর দুই পুত্র যদু ও তুর্বসু। বিবিধ শাস্ত্রে তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। ন্যায়পূর্বক প্রজাশাসন করা সত্ত্বেও যযাতি শুক্রচার্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হলেন। দীর্ঘদিন ভোগসুখে বঞ্চিত থাকার পর একদিন তিনি পুত্রদের ডেকে যুবতীদের সাথে বিহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। একারণে তিনি পুত্রদের সাহায্য চাইলেন। সবকিছু শুনে অন্য পুত্রেরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও কনিষ্ঠ পুত্র পুরু রাজার প্রস্তাবে রাজি হলেন। রাজা যযাতি তপোবলে পুত্রের দেহে জরা সঞ্চারিত করে স্বয়ং যৌবন লাভ করলেন। অপরদিকে পুরু জরাগ্রস্ত হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। প্রায় হাজার বছর রাজা যযাতি ইচ্ছানুরূপ বিষয় আশয় ভোগ করলেন। কিন্তু তিনি কোনও মতেই পরিতৃপ্তি পেলেন না। সহসা তাঁর মনে হল-

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।। [41]

কাম্যবস্তুর উপভোগে কামনার উপশম হয় না । আগুনে ঘি ঢাললে তা ক্রমশ বেড়েই চলে। পৃথিবীর সমস্ত পশু ও নারী উপভোগ করেও তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। তাই শান্তির পথই একমাত্র পথ। কারও কোনওরূপ অনিষ্টচিন্তা না করলে সেটাই ব্রহ্মের সমান

[41] মহা

আনন্দদায়ক হয়। বৈরাগ্যের এই সার কথাটি তিনি বুঝলেন এবং সেইমতো পুত্রকে ডেকে তিনি তাঁর যৌবন প্রত্যর্পণ করলেন।

পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে বললেন, বৎস, তুমিই যথার্থ পুত্রের কার্য সম্পাদন করেছ। তোমার দ্বারাই আমার বংশরক্ষা হবে এবং তোমার বংশই পুরুবংশ বলে অভিহিত হবে। এই কথা বলে রাজা যযাতি তপস্যা আরম্ভ করলেন এবং অনশন ব্রত অবলম্বন করে স্বর্গগমন করলেন।

পুরু

মহাভারতে কথিত কুলপঞ্জিকা অনুসারে যযাতির পুত্র হলেন পুরু। পুরু ব্যক্তিনামের পরিবর্তে জাতিনাম ঋগ্বেদে সুলভ।

অহমিন্দো ন পরা জিগ্য ইন্ধনং ন মৃত্যবেবতস্থে কদাচন।

সোমমিন্মা সুন্বন্তো যাচতা বসু ন মে পুরবঃ সখ্যে রিষাথন।। [42]

কেউ কখনও কোনও সম্পত্তি আমার নিকট জয় করে নিতে পারেনি, মৃত্যুর নিকট কখনও আমি নত হইনি। হে পুরুবংশীয়গণ, তোমরা সোমরস প্রস্তুত করে যা ইচ্ছা আমার নিকট যাচঞা করো, দেখো, আমার বন্ধুত্ব যেন কখনও তোমরা হারিও না।

মহাভারতের কুলপঞ্জিকা অনুসারে পুরুবংশের বর্ণনা দেখা যায় এইভাবে।

[42] ঋ সং ১০।৪৮।৫

রাজা পুরুর পত্নী পৌষ্টীর গর্ভে প্রবীর, ঈশ্বর এবং রৌদ্রাশ্ব নামে তিন মহারথী পুত্র জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রবীরের পুত্রের নাম ছিল মনস্যু, যিনি প্রবীরের স্ত্রী শূরসেনীর সন্তান। মনস্যুরভবৎ তস্মাচ্ছূরসেনীসুতঃ প্রভুঃ।[43] মনস্যুর পত্নী সৌবীরীর অন্বগ্ভানু প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মেছিল।

পুরুর তৃতীয় পুত্র রৌদ্রাশ্বের পত্নী অপ্সরা মিশ্রকেশীর অন্বগভানু প্রভৃতি দশজন পুত্র জন্মেছিলেন।

অন্বগভানুপ্রভৃতয়ো মিশ্রকেশ্যাং মনস্বিনঃ।

রৌদ্রাশ্বস্য মহেষ্বাসা দশাপ্সরসি সূনবঃ।।[44] তাঁদেরনাম হল- ঋচেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্মেয়ু এবং সন্নতেয়ু। ঋচেয়ু এর অপর নাম ছিল অনাধৃষ্টি। অনাধৃষ্টির পুত্রের নাম ছিল মতিনার। রাজা মতিনারের চার পুত্র যথা- তংসু, মহান্, অতিরথ এবং দ্রুহ্য। তংসুর ঈলিন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈলিনের পত্নী রথন্তরী পাঁচপুত্রের জন্ম দেন। তাঁরা হলেন- দুষ্মন্ত, শূর, ভীম, প্রবসু এবং বসু। জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে দুষ্মন্ত সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ছিলেন ভরত।

ভরত

ঋগ্বেদে ভরত জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদোক্ত ভরত জাতির রাজারা দানশীল ও নানা গুণযুক্ত। তাঁদের নামের কুলপঞ্জিও ঋগ্বেদের সূক্ত অনুযায়ী নির্মাণ করা যায়।

[43] মহা আদি ৯৪ । ৬ ক

[44] মহা আদি ৯৪ । ৮

দিবোদাস, পিজবন, সুদাস ইত্যাদি বিখ্যাত বৈদিক রাজার কথা সুপ্রসিদ্ধ যাঁরা হলেন ভরতবংশীয়।[45] ঋগ্বেদের দশ রাজা ও ভরতগণের যুদ্ধ একটি বিখ্যাত বৃত্তান্ত। এই ভরতগণের নাম অনুসারে এই দেশের নাম ভারত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

মহাভারতে ভরত হলেন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র। তাঁর নাম অনুসারেও দেশের নাম ভারত হয়েছে বলে কারও কারও ধারণা। কোনও সম্ভাবনাকেই বাতিল করা যায় না যেহেতু উভয় ভরতই গুরুত্বের বিচারে তুল্যমূল্য বলে গণ্য হতে পারেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের নাম অনুসারে সেই বংশের নামও ভরতবংশ। এই ভরতবংশীয় রাজাদের জন্মকাহিনি-ই মহাভারত আখ্যা লাভ করেছে। মহাভারতেই বলা হয়েছে- ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারতমুচ্যতে। [46]

ভরত বংশের খ্যাতি সমৃদ্ধ করেছিলেন বলে এই বংশ ভরতবংশ নামে আখ্যালাভ করে।| রাজা ভরত তিন পত্নীর কাছ থেকে নয় পুত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু পুত্রগণ তাঁর অনুরূপ নয়- এরূপ মন্তব্য করে রাজা তাঁর পুত্রদের অভিনন্দন জানাননি। তখন সেই পুত্রদের মাতারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের হত্যা করেন। সেই কারণে রাজা ভরতের বহু পুত্রোৎপাদন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল| রাজা ভরত বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং ঋষি ভরদ্বাজের কৃপায় ভূমন্যু নামে এক পুত্র লাভ করেছিলেন। তারপর পুরুবংশের আনন্দবর্ধনকারী ভরত ভূমন্যুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

ভরতের পরবর্তী রাজগণ

[45] ঋ সং ২।৭।১; ৩।৩৩। ১২

[46] মহা, স্বর্গা ৫।৪৫

ভরতপুত্র ভূমন্যুর দিবিরথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর সুহোত্র, সুহোতা, সুহবি, সুজেয় ও ঋচীক নামেও পুত্র ছিল। এঁরা সকলে পুষ্করিণীর গর্ভে জন্মেছিলেন। তবে জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে সুহোত্র রাজ্যলাভ করেছিলেন। রাজা সুহোত্র রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করে আসমুদ্র বিস্তৃত পৃথিবীর হস্তী, অশ্ব এবং বিবিধ রত্নসামগ্রী উপভোগ করেছিলেন। যখন রাজা সুহোত্র ধর্মপূর্বক প্রজাদের শাসন করেছিলেন তখন গজ, অশ্ব, রথ ও মানুষে সমৃদ্ধ ছিল পৃথিবী। রাজা সুহোত্রের অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র ছিল।

তাঁদের মধ্যে অজমীঢ় ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর তিন স্ত্রী ও ছয় পুত্র ছিল। ধুমিনী ঋক্ষকের, নীলী দুষ্মন্ত বা পরমেষ্ঠীর এবং কেশিনী জহ্নু ব্রজন ও রূপিণের জন্ম দেন। তাঁদের মধ্যে দুষ্মন্ত বা পরমেষ্ঠীর সব পুত্রকে পাঞ্চাল বলে। অত্যন্ত তেজস্বী জহ্নুর বংশ কুশিক নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ঋক্ষপুত্র সংবরণ যখন এই পৃথিবী শাসন করেন তখন প্রজাদের খুব বড় ক্ষতি হয়েছিল। এর ফলে সমগ্র রাজ্য ব্যাপক দুর্দিনের সম্মুখীন হয়েছিল। শত্রুদের সেনাপতি ভরতবংশীয় যোদ্ধৃগণকে নির্বিচারে দমন করতে শুরু করল। পাঞ্চালরাজ চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে পৃথিবী কম্পিত করে সংবরণকে আক্রমণ করলেন এবং দশ অক্ষৌহিণী সেনা দ্বারা সংবরণকে যুদ্ধে পরাজিত করে সকল রাজ্য জয় করলেন। তখন সংবরণ স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ও মন্ত্রীকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে সিন্ধুতীরবর্তী পর্বতের পাদদেশে এক গৃহে বাস করতে লাগলেন। সেই দুর্গে আশ্রয় নিয়ে ভরতবংশীয় রাজা বহু বছর অক্ষত ছিলেন। হঠাৎ একদিন মহর্ষি বসিষ্ঠ তাঁর কাছে এলেন। ঋষিকে দেখে ভরতবংশীয়রা অতিশয় আতিথ্যপ্রদর্শন ও প্রণামপূর্বক তাঁকে যথোচিত অর্ঘ্য প্রদান করলেন। এরপর মহর্ষিকে

নিজের সবকিছু অর্পণ করে উচ্চ আসনে বসিয়ে রাজা স্বয়ং তাঁকে বরণ করলেন এবং বললেন, **ভগবান, আমি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চাই, আপনি আমার পুরোহিত হউন।** তখন ঋষি স্বয়ং সমস্ত ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ পুরুবংশীয় হিসাবে সংবরণকে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের সম্রাট পদে অভিষিক্ত করলেন। পরে রাজা সংবরণ পূর্বের মতো শ্রেষ্ঠ নগরে বাস করতে লাগলেন। পুনরায় তিনি সকল রাজাদের জয় করেছিলেন। রাজ্য জয় করে তিনি বহু দান ও প্রচুর যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।

কুরু

রাজা কুরুর নামাঙ্কিত কুরুক্ষেত্রের নাম বৃহদ্দেবতায় পাওয়া যায়।

সেখানে দেখা যায় কণ্বপুত্র সোভরি নিজ বংশের মানুষদের সঙ্গে যজ্ঞ করেছিলেন–

কণ্বস্য সোভরেশ্চৈব যজতো বংশজৈঃ সহ।

কুরুক্ষেত্রে যবাঞ্ছক্ষুর্ হবীংষি বিবিধানি চ।। [47]

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে কুরুশব্দের উল্লেখ দেখা যায়। [48] মহাভারতে কথিত আছে রাজা সম্বরণ সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরু নামক পুত্রের জন্ম দেন। কুরুকে ধর্মজ্ঞ মেনে প্রজাবর্গ স্বয়ং তাঁকে রাজপদে বরণ করলেন। তাঁর নামেই পৃথিবীতে কুরুজাঙ্গলদেশ প্রসিদ্ধ হয়েছিল। মহাতপস্বী কুরু নিজ তপস্যাবলে কুরুক্ষেত্রকে পবিত্র করেছিলেন।

---

[47] বৃ দে ৬। ৫৮

[48] বিভাষা কুরুযুগন্ধরাভ্যাম্; পা ৪।২।১৩০

কুরুপরবর্তী রাজগণ

কুরুর পত্নী বাহিনী পাঁচ পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন- অশ্ববান্, ভবিষ্যন্ত, চৈত্ররথ, মুনি এবং জনমেজয়। অশ্ববানের অপর নাম অবিক্ষিত। তাঁর আট পুত্র হলেন- পরিক্ষিত, শবলাশ্ব, আদিরাজ, বিরাজ, শাল্মলি, উচ্চৈঃশ্রবা, ভঙ্গকার এবং জিতারি। জনমেজয় প্রভৃতি অপর সাত মহারথী কর্মবলে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। পরিক্ষিতের অন্যান্য পুত্রদের নাম যথাক্রমে- কক্ষসেন, উগ্রসেন, চিত্রসেন, ইন্দ্রসেন, সুষেণ এবং ভীমসেন।

জনমেজয়ের প্রথম পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর অনুজ ভ্রাতারা হলেন- পাণ্ডু, বাহ্লীক, নিষধ, জাম্বুনদ, কুণ্ডোদর, পদাতি এবং বসাতি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা হলেন- কুণ্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রাথ, কুণ্ডিন, হবিঃশ্রবা, ইন্দ্রাভ, ভূমন্যু, অপরাজিত, প্রতীপ, ধর্মনেত্র ও সুনেত্র। প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে দেবাপি ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়ে কল্যাণপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বনে চলে যান। তাই শান্তনু ও বাহ্লীক রাজ্যলাভ করেন।

.....

তৃতীয় অধ্যায়

দশরাজার সংগ্রাম ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ : তুলনাত্মক সমীক্ষা

তৃতীয় অধ্যায়

দশরাজার সংগ্রাম ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ : তুলনাত্মক সমীক্ষা

আর্য ও দাস-দস্যু অনার্যের সংঘাতের বিবরণ সমগ্র ঋগ্বেদ জুড়েই দেখতে পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মহাভারতেও সর্বত্র বিস্তৃতভাবে নানা যুদ্ধের বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ স্থানলাভ করেছে। এই সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে ঋগ্বেদে উল্লিখিত ভরত জাতির রাজা সুদাসের সঙ্গে যদু তুর্বশ প্রভৃতি দশটি জাতির সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধকথা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঋগ্বেদের এই যুদ্ধের ঘটনা দাশরাজ্ঞ নামে পরিচিত।[49] অন্যদিকে মহাভারতে নানা যুদ্ধের কথা থাকলেও কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই মহাকাব্যের কেন্দ্রবিন্দু বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। এখন আমরা ঋগ্বেদের এই দশরাজার যুদ্ধ ও মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একটি তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করব।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত ভরত জাতির নাম অনুসারে এ দেশের নাম ভারত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এই ভরতরা সরস্বতী ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন। সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও আপয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তাঁদের যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণ ঋগ্বেদে পরিলক্ষিত হয়। এই ভরতদের রাজার নাম সুদাস। তিনি যদু অনু প্রভৃতি দশ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং জয়ী হন।[50] ঋগ্বেদে উল্লিখিত এই দাশরাজ্ঞ যুদ্ধ পরুষ্ণী নতীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে সুদাসের বিরুদ্ধে যে রাজারা ছিলেন সম্ভবত তাঁরা হলেন- যদু, তুর্বশ, অনু, দ্রুহ্য, পুরু, অলিন, ভলান, পক্থ, এবং বিষাণী। ঋগ্বেদে কথিত গন্ধারি, পক্থ, অলিন, ভলান, বিষাণী প্রভৃতি জাতি ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী। সিন্ধু ও পঞ্জাব অঞ্চলে যাঁরা বসবাস করতেন তাঁদের মধ্যে শিব, পর্শু, কেকয়, বৃচীবন্ত, যদু, অনু, তুর্বশ ও দ্রুহ্য প্রসিদ্ধ। যদু ও তুর্বশরা পাঞ্জাবের দক্ষিণ

[49] ঋ সং ৭।৮৩।৮

[50] ঋ সং ৭।৮৩।৬,৭,৮

অঞ্চলের অধিবাসী। [51] অনুদের বাসস্থান ছিল পরুষ্ণীর তীরবর্তী অঞ্চল।[52] দ্রুহ্যগণ পরুষ্ণী ও চন্দ্রভাগার মধ্যস্থলবাসী বলে মনে করা হয়। অলিন জনগোষ্ঠী কাফিরিস্তানের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী এবং তাঁরা পক্থদের সঙ্গে দশ রাজার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান বোলান গিরিপথের নামটি ভলান জাতির নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যাঁরা পক্থ অধ্যুষিত অঞ্চলের দক্ষিণ অংশে বাস করতেন বলে মনে করা হয়। [53]

তৃৎসু জাতি পরুষ্ণী (ইরাবতী)-র পূর্বদিকে বাস করতেন। ভরতদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। সেই কারণে অনেকে তৃৎসু ও ভরত জাতিকে অভিন্ন মনে করেন। রাজা সুদাস ছিলেন এই তৃৎসু-ভরত বা সংক্ষেপে ভরত গোষ্ঠীর অধিপতি। সুদাসের পূর্বপুরুষ দিবোদাসের কথাও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মনে করা হয় এই দিবোদাস ভরত গোষ্ঠীর রাজা হিসাবে তৎকালীন ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। ঋগ্বেদের আর্ষেয় মণ্ডলে অর্থাৎ দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলে ভরত জাতির উল্লেখ গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়।

সম্ভবত ভরতগণ পুরুদের ঘনিষ্ঠ ছিল কিন্তু পরে পরুষ্ণী নদীতীরে তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ভরতদের ক্ষমতার অগ্রগতি ঋগ্বেদের আর্ষেয় মণ্ডল থেকে স্পষ্ট জানা যায়। ভরতদের রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন বিশ্বামিত্র। নিরুক্তে দেখা যায়- বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সুদাসঃ পৈজবনস্য পুরোহিতো বভূব।[54] পরে বসিষ্ঠ তাঁর স্থানাধিকারী হন এবং বিশ্বামিত্র পুরুগোষ্ঠীর আনুগত্য লাভ করেন। বসিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের বহু সূক্তের রচয়িতা এবং তিনি এখানে ভরতদের বিশেষত তাঁদের রাজা সুদাসের জয়গান করেছেন।

চত্বারো মা পৈজবনস্য দানাঃ স্মদ্দিষ্টয়ঃ কৃশনিনো নিরেকে।

ঋজ্রাসো মা পৃথিবিষ্ঠাঃ সুদাসস্তোকং তোকায় শ্রবসে বহন্তি।।[55]

---

[51] ঋ সং ১।৩৬।১৮, ১।৫৪।৬, ১।১৫৪।৯

[52] ঋ সং ৮।৭৪।১৫

[53] ভা বৈ যু, পৃ ২৮

[54] নি ২।১।২৪।১৪

[55] ঋ সং ৭।১৮।২৩

অর্থাৎ দানাঙ্গযুক্ত স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট, দুর্গতিতে ঋজুগামী ও পৃথিবীস্থিত পিজবনপুত্র সুদাসের প্রদত্ত চারটি অশ্ব পুত্রবৎ পালনীয় বসিষ্ঠকে পুত্রের অন্নার্থে বহন করছে।

সুদাসের পূর্বপুরুষ দিবোদাসকে ধনদাতা হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। যাস্ক সুদাস নামের নির্বচনে দেখিয়েছেন – সুদাঃ কল্যাণদানঃ অর্থাৎ সুদাস নামের অর্থ অল যাঁর দান কল্যাণকর বা মঙ্গলদায়ী।[56]

সুদাসের দানের কথা বসিষ্ঠদৃষ্ট মন্ত্রে দেখা যায়-

যস্য শ্রবো রোদসী অন্তরুর্বী শীর্ষ্ণে শীর্ষ্ণে বিবভাজা বিভক্তা।

সপ্তেদিন্দং ন স্রবতো গৃণন্তি নি যুধ্যামধিমশিশাদভীকে।।[57]

অর্থাৎ যে সুদাসের যশ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত, যে দাতাশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ধন দান করেন, সপ্তলোক তাঁকে ইন্দ্রের ন্যায় স্তব করে।

ভরতদের রাজা সুদাসের পূর্বপুরুষ দিবোদাস ও পিজবন এবং উত্তরপুরুষ দেবাশ্রব ও দেবাবত ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয়েছেন। সৃঞ্জয় দৈবাবত সম্ভবত দেবাবতের পুত্র।

ভরতদের রাজা সুদাস দশ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন – এই হল দাশরাজ্ঞ যুদ্ধবৃত্তান্তের মূল কথা।[58] সপ্তম মণ্ডলে উল্লিখিত এই যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল- ভরতরা এই যুদ্ধজয়ের পর সিন্ধুনদ অতিক্রম করে পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে প্রবেশ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে পুরুসমেত দশ রাজাকে পরাজিত করে ভরতগণ নদীর ওপর আধিপত্য অর্জন করেন। ঋগ্বেদের বর্ণনায় দেখা যায় ভরতদের রাজা তাঁর রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বের সমস্ত শত্রুকে দমন করেছেন। দক্ষিণেও তাঁর কোনও শত্রু ছিল না কেননা সেদিকে ছিল খাণ্ডববনের অবস্থান। ঋগ্বেদের এই বর্ণনা মহাভারতের খাণ্ডবদাহনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দশরাজার বিরুদ্ধে জয়ী ভরতেরা কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত তাঁদের রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। সম্ভবত দক্ষিণ সীমান্তেই ছিল খাণ্ডবারণ্যের অবস্থিতি।

---

[56] নি ২।১।২৪।১৭

[57] ঋ সং ৭।১৮।২৪

[58] ভা বৈ যু, পৃ ২৯

ঐতিহাসিক রণবীর চক্রবর্তী দাশরাজ্ঞ যুদ্ধকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বরূপ বলে অনুমান করেছেন। তাঁর কথায়- The Rgvedic accounts of the Dāśarajna probably offer a prototype of the great Mahabharata battle at Kurukshetra. [59]

এখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে অনুসন্ধান করণীয়। এ সম্বন্ধে মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে-

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।

সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।।[60]

অর্থাৎ কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

সমন্তপঞ্চক নামক স্থানে চারদিকে পাঁচটি হ্রদ থাকার জন্যে এই নামকরণ। কথিত আছে পরশুরাম যুদ্ধে পৃথিবীকে একুশ বার ক্ষত্রিয়শূন্য করে এই স্থানে পাঁচটি শোণিতময় হ্রদে পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করেন।

এই সমন্তপঞ্চকই কুরুক্ষেত্র তীর্থ নামে খ্যাত। কুরুদেশের অন্তর্গত ক্ষেত্র হওয়ায় অথবা কুরুরাজ কর্তৃক কৃষ্ট হওয়ার জন্যে এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত। মহাভারতেই উক্ত হয়েছে যে কুরুরাজ উগ্র তপস্যায় এই ক্ষেত্রটি কর্ষণ করেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক এই বর লাভ করেন যে এই স্থানে প্রয়াত ব্যক্তির পুণ্যলাভ হবে।

এই কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান যোদ্ধা হলেন- ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য, দুর্যোধন প্রভৃতি শত ভ্রাতা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মাহিস্পতীরাজ নীল, অবন্তীরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, ত্রিগর্তরাজ সত্যরথ, গান্ধাররাজ শকুনি, মধুবংশীরাজ জরাসন্ধ প্রভৃতি।

---

[59] EEI, p. 57

[60] মহা আদি ১।১৩

অপরদিকে পাণ্ডবপক্ষে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে মুখ্য যোদ্ধা হলেন- যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব- এই পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, উত্তমৌজা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি।

দেখা যায় এই যুদ্ধে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সমস্ত রাজাই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্যাপকতা ও ভয়াবহতায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্য কোনও যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি ছিল অপরিমেয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকলেই নিহত হন।

ঋগ্বেদে কথিত দাশরাজ্ঞ যুদ্ধে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বরূপ অনুসন্ধান যাঁরা করেছেন তাঁদের বক্তব্যে অনুমাননির্ভরতা অধিক। একথা যথার্থ যে ভরত ও দশরাজার যুদ্ধে অনেক সৈন্যের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা কারণ সম্মিলিত বাহিনীতে যোদ্ধাদের সংখ্যা অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। সঞ্জয়ের মুখে সৈন্যবাহিনীর বিবরণ-

একাদশৈতাঃ শ্রীজুষ্টা বাহিন্যস্তব পার্থিব।।

পাণ্ডবানাং তথা সপ্ত মহাপুরুষপালিতাঃ।।[61]

অর্থাৎ হে রাজা, আপনার পক্ষে এগারো অক্ষৌহিণী সেনা এবং পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিণী বীর পুরুষদের দ্বারা সুরক্ষিত সেনা সুশোভিত দেখা যাচ্ছে।

বেদে ভরতজাতির বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন দশ জন রাজার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল ভরতবংশীয়দের গৃহযুদ্ধ। এখানে একপক্ষে কৌরব অপরপক্ষে পাণ্ডব। যদিও পাণ্ডবরাও কৌরববংশীয় তবুও পাণ্ডুপুত্র হওয়ার জন্যে তাঁদের এই নামেই পরিচয়। দু পক্ষেই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজার অংশগ্রহণ দাশরাজ্ঞের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তুলনীয় হতে পারে, যদিও উভয় যুদ্ধের সেনাপতি বা যোদ্ধাদের নামের সাদৃশ্য দেখা যায় না। মহাভারতে বর্ণিত অধিক সৈন্যসমন্বিত কৌরববাহিনীর পরাজয়ের সঙ্গে বেদের বৃত্তান্তে কথিত দশ রাজার সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয়ের তুলনাও অযৌক্তিক নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনাও কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। তবুও ঋগ্বেদে উল্লিখিত

[61] মহা, ভীষ্ম ১৬। ২৫ খ, ২৬ ক

ভরত ও দশ রাজার যুদ্ধকে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বরূপ বলে মনে করার জন্যে আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয়।

.....

চতুর্থ অধ্যায়

বেদে মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রের মূল অনুসন্ধান

চতুর্থ অধ্যায়

বেদে মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রের মূল অনুসন্ধান

কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত রাজগণকে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে তাঁদের বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। এই পর্যায়ে মহারাজ প্রতীপের পুত্র শান্তনু থেকে জনমেজয়ের পুত্র অশ্বমেধদত্ত এবং তাঁদের মধ্যবর্তী প্রজন্মের রাজগণের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণচরিত্র ভরতবংশীয় নয়, কিন্তু কৃষ্ণ মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তাই তাঁর সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। এই রাজাদের কথা মহাভারতে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। তবে বৈদিক সাহিত্যে এঁদের সকলের উল্লেখ নেই। একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, পাণ্ডু থেকে অভিমন্যু পর্যন্ত তিন প্রজন্মের বৃত্তান্ত বেদে বিরল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় নয়, তবু সেটি এমন একটি বিষয় যা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধা পাণ্ডবপক্ষীয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের নাম বৈদিক সাহিত্যে সহজলভ্য নয়। এখন আমরা শান্তনু এবং তাঁর পরবর্তী ভরতবংশীয় রাজাদের কথা বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে যে ভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

শন্তনু

ঋগ্বেদে শান্তনু নামের পরিবর্তে শন্তনু এই নামটি পাওয়া যায়। রাজা শন্তনুর উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের আটানব্বইতম সূক্তে। এই শন্তনু-ই যে মহাভারতের রাজা শান্তনু তা সহজেই অনুমেয়। তিনি একজন রাজা এবং তাঁর পুরোহিত হলেন

ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি একথা এই সূক্ত থেকে জানা যায়। রাজা শন্তনুর দ্বারা অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে তাঁর পুরোহিত দেবাপি বৃষ্টি আনয়নের জন্যে স্তব করেছিলেন। এই সূক্তে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রারম্ভিক মন্ত্রে দেখা যায় বৃহস্পতির প্রতি প্রার্থনা-

বৃহস্পতে প্রতি মে দেবতামিহি মিত্রো বা যদ্বরুণো বাসি পুষা।

আদিত্যৈর্বা যদ্বসুভির্মরুতান্ত্ স পর্জন্যং শন্তনবে বৃষায়।।[62]

মন্ত্রার্থ হল- হে বৃহস্পতি, তুমি আমার জন্য প্রত্যেক দেবতার নিকটে যাও। তুমি মিত্র, বরুণ বা পুষাই হও, অথবা আদিত্যগণ বা বসুগণসমেত ইন্দ্রই হও, তুমি শন্তনু রাজার জন্যে মেঘকে বারিবর্ষণ করাও।

অনুমান করা যেতে পারে শন্তনু রাজার যজ্ঞে এই সূক্ত রচিত হয়েছিল। ওই একই সূক্তের তৃতীয় ঋকে শন্তনুর উল্লেখ আবার পরিলক্ষিত হয়-

অস্মে ধেহি দ্যুমতীং বাচমাসনবৃহস্পতে অনমীবামিষিরাম্।

যয়া বৃষ্টিং শন্তনবে বনাব দিবো দ্রপ্সো মধুমাঁ আ বিবেশ।।[63]

এ মন্ত্রের অর্থ হল- হে বৃহস্পতি, আমাদের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলে দাও যা অস্পষ্টতাদোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়। তা দিয়ে আমরা শন্তনুর জন্যে বৃষ্টি উপস্থিত করি। মধুযুক্ত রস আকাশ হতে আগমন করুক।

---

[62] ঋ সং ১০।৯৮।১

[63] ঋ সং ১০।৯৮।৩

দেখা যাচ্ছে এই ঋকে রাজা শন্তনুর জন্যে বৃষ্টি কামনা করা হয়েছে।

এই সূক্তের সপ্তম মন্ত্রে দেখা যায় -

যদ্দেবাপিঃ শন্তনবে পুরোহিতো হোত্রায় বৃতঃ কৃপয়ন্নদীধেৎ।

দেবশ্রুতং বৃষ্টিবনিং ররাণো বৃহস্পতির্বাচমস্মা অযচ্ছৎ।।[64]

মন্ত্রার্থ- যখন শন্তনুর পুরোহিত দেবাপি হোম করার জন্যে উদ্যোগী হয়ে বৃষ্টি উৎপাদনকারী দেবস্তব ধ্যানদ্বারা নিরূপিত করলেন তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনে সে স্তুতিবাক্যের উদয় করে দিয়েছিলেন।

শুধুমাত্র এই সূক্ত থেকে মহাভারতের শান্তনুর ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে তিনি যে যাগযজ্ঞে আস্থাশীল যজমান সেটুকু জানা যায়। আবার মহাভারতের দেবাপি শান্তনুর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সেই দেবাপি বাল্যকালে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করেন। মহাভারত অনুসারে তাঁর শান্তনু নামকরণের কারণ হল তিনি যাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন, বৃদ্ধ হলেও তাঁর দেহে নবযৌবন সঞ্চারিত হত। শান্তস্য জজ্ঞে সংন্তানস্তস্মাদাসীৎ স শান্তনুঃ [65] । জ্যেষ্ঠভ্রাতা সন্ন্যাসগ্রহণ করায় তিনি পিতৃরাজ্য লাভ করেন। ঋগ্বেদের শন্তনুর সঙ্গে তাঁর এক বিষয়ে মিল দেখা যায় যে উভয়েই ধর্মাত্মা। মহাভারতের কথাবস্তু অনুযায়ী শান্তনুর পিতা ও মাতা যথাক্রমে প্রতীপ ও সুনন্দা। সুন্দর, রূপবান, প্রিয়য়দর্শন শান্তনু ছিলেন ত্যাগ, নিষ্ঠা, সত্য ও ধর্মের পূজারি।

---

[64] ঋ সং ১০।৯৮।৭

[65] মহা আদি ৯৫।৪৬; ৯৭।১৯

সংস্মরংশ্চাক্ষয়াঁল্লোকান্ বিজানাৎ স্বেন কর্মণা।।

পুণ্যকর্মকৃদেবাসীচ্ছান্তনুঃ কুরুসত্তমঃ।[66]

নিজের সৎকর্ম দ্বারা উপার্জিত পূণ্যলোক স্মরণ করে কুরুশ্রেষ্ঠ শান্তনু সর্বদা নিজেকে পুণ্যকর্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত রাখতেন।

যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত ঋগ্বেদ ও মহাভারতের ব্যবধানটুকু পূর্ণ করে দেয়। এখানে আচার্য যাস্কের ইতিহাসবর্ণনা নিম্নরূপ-

দেবাপিশ্চার্ষ্টিষেণঃ শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতরৌ বভূবতুঃ, স শন্তনুঃ কনীয়ানভিষেচয়াঞ্চক্রে, দেবাপিস্তপঃ প্রতিপেদে, ততঃ শন্তনো রাজ্যে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ, তমুচুর্ব্রাহ্মণাঃ, অধর্মস্ত্বয়া চরিতো জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমন্তরিত্যাভিষেচিতং তস্মাত্তে দেবো ন বর্ষতীতি, স শন্তনুর্দেবাপিং শিশিক্ষ রাজ্যেন, তমুবাচ দেবাপিঃ পুরোহিতস্তেসানি যাজয়ানি চ ত্বেতি, তস্যৈতদ্বর্ষকামসূক্তম্, তস্যৈষা ভবতি। [67]

মর্মার্থ হল- কৌরববংশীয় ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি এবং শন্তনু দুই ভ্রাতা ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপি তপস্যায় নিরত হওয়ার জন্যে কনিষ্ঠ শন্তনু রাজপদে অভিষিক্ত হন। এইভাবে জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করার অপরাধে দেবতাগণ রুষ্ট হয়ে দ্বাদশ বৎসর শন্তনুর রাজ্যে বৃষ্টিপ্রদান স্থগিত রাখেন। ব্রাহ্মণেরা এই মর্মে শন্তনুকে বার্তাজ্ঞাপন করলে শন্তনু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপিকে রাজ্যগ্রহণের অনুরোধ জানান। তখন দেবাপি শন্তনুকে তাঁর পুরোহিত হওয়ার এবং তাঁর জন্যে যজ্ঞ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তা পালন করেন।

---

[66] মহা আদি ১০০ অ

[67] নি০ ২।১।১০।১৬

বর্ষণকামী দেবাপির নিকট ঋগ্বেদের উক্ত সূক্তটি প্রকাশিত হয়েছিল বলে নিরুক্ত থেকে জানা যায়।

লক্ষণীয়, নিরুক্ত অনুসারে দেবাপি ও শন্তনুর পিতার নাম প্রতীপ নয়, ঋষ্টিসেন। তবে প্রতীপ ও ঋষ্টিসেন একই ব্যক্তি কি না তা বিচার্য বিষয়। কিন্তু তাঁরা যে কুরুবংশীয় ছিলেন তা নিরুক্ত থেকে স্পষ্ট হয়। ফলে মহাভারতের শান্তনুর সঙ্গে ঋগ্বেদের শন্তনুর একত্বের সম্ভাবনা অধিক হয়ে পড়ে। দেবাপি যে শন্তনুর পৌরোহিত্য করেছিলেন এবং তাঁর জন্যে বৃষ্টিকামনা করেছিলেন ঋগ্বেদের সূক্ত তারই ঘোরতর সাক্ষ্য দেয়।

শন্তনু নামের নির্বচন নিরুক্তকার দেখিয়েছেন- শন্তনুঃ শন্তনোস্ত্বিতি বা শমস্মৈ তন্বা অস্ত্বিতি বা। অর্থাৎ যিনি বলেন- 'হে দুর্বল তোমার সুখ হোক বা এই শরীরের সুখ হোক', তিনিই শন্তনু।

শৌনকরচিত বৃহদ্দেবতায় শন্তনু ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

আর্ষ্টিষেণস্তু দেবাপিঃ কৌরব্যশ্চৈব শন্তনুঃ।

ভ্রাতরৌ কুরুষু ত্বেতৌ রাজপুত্রৌ বভূবতু।।

জ্যেষ্ঠস্তয়োস্তু দেবাপিঃ কনীয়াংশ্চৈব শন্তনু।

ত্বগ্‌দোষী রাজপুত্রস্তু ঋষ্টিষেণসুতোভবৎ।।

রাজ্যেন ছন্দয়ামাসুঃ প্রজাঃ স্বর্গং গতে গুরৌ।

স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা প্রজাস্তাঃ প্রত্যভাষত।। [68]

দেবাপি জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শন্তনু রাজা হন। দেবাপি চর্মরোগে পীড়িত ছিলেন তাই স্বেচ্ছায় তিনি রাজ্যভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শন্তনুর ওপর অর্পণ করেন। [69]

এবার মহাভারতে বর্ণিত শান্তনুর কথায় আসা যাক। শান্তনু ব্যসনাসক্ত ছিলেন। তিনি মৃগয়া করতে ভালবাসতেন।

স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ দেবরাজসমদ্যুতিঃ।

বভুব মৃগয়াশীলঃ শান্তনুর্বনগোচরঃ।। [70]

মহাভারতের কাহিনিতে দেখা যায়- বুদ্ধিমান রাজা শান্তনু ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের সমান তেজস্বী। হিংস্র পশু হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। একদা মৃগয়াসক্ত রাজা এক সুন্দরী যুবতীকে দেখে তাকে লাভ করার কামনায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। কামনার অন্তিম পর্যায়ে সেই যুবতী, যিনি আসলে দেবী গঙ্গা, এক বিশেষ শর্তে রাজার ধর্মপত্নী হতে সম্মত হলেন। সেই শর্তটি হল কখনও কোনও দিন তাঁকে কোনও প্রকার কর্মে বাধা দেওয়া যাবে না।

যৎ তু কুর্যামহং রাজঞ্ছুভং বা যদি বাশুভম্।

---

[68] বৃ দে ৭।১৫৫-১৫৭

[69] বৃ দে ৮।১-১০

[70] মহা আদি ৯৭।২৫

ন তদ্ বারয়িতব্যাস্মি ন বক্তব্যা তথাপ্রিয়ম্।।[71]

রাজা গঙ্গাদেবীর শর্ত অনুসারে উপযুক্ত বিধি অনুসারে গঙ্গাকে বিবাহ করলেন। এরপর রাজা শান্তনুর ঔরসে গঙ্গাদেবী সাতটি পুত্রের জন্ম দেন। গঙ্গা পুত্রজন্মরে পরইে পতরি প্রীতি উ□পাদন করছি- এই বলে তাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেন।

জাতং জাতং চ সা পুত্রং ক্ষিপত্যম্ভসি ভারত।

প্রীণাম্যহং ত্বামিত্যুক্ত্বা গঙ্গা স্রোতস্যমজ্জয়ৎ।।[72]

পুত্রহারা পিতা শোকে প্রায় মূর্ছা যান, তবুও শর্তের কথা মনে করে রাজা প্রতিবাদ করেন না, মৌনী থাকেন। কিছুকাল পর যখন অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন, তখন রাজা পুনরায় পুরবর্তী পুত্রগণের পরিণতির কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাই শেষ পুত্রের জন্মলাভের পর তার মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে পত্নীর সঙ্গে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। পত্নীকে তিনি বলে ফেলেন-

মা বধীঃ কস্য কাসীতি কিং হিনৎসি সুতানিতি।

পুত্রঘ্নি সুমহৎ পাপং সম্প্রাপ্তং তে সুগর্হিতম্।।[73]

এইভাবে পত্নীর পুত্রহত্যায় শান্তনু বাধা প্রয়োগ করেন। তখন গঙ্গাদেবী তাঁকে আপন পরিচয় দিয়ে অন্তর্হিত হন। শান্তনুর এই অষ্টম পুত্রের নাম হল ভীষ্ম। কিন্তু পত্নীহারা রাজা শান্তনুর মনে ও প্রাণে দুঃখের সীমা রইল না। কিছুদিন পর রাজা তাঁর একমাত্র

---

[71] মহা আদি ৯৮। ৩

[72] মহা আদি ৯৮। ১৩

[73] মহা আদি ৯৮ । ১৬

পুত্র শিশুকাল অতিক্রম করলে, তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে পুনরায় মৃগয়ায় বের হন।

মৃগয়াকালে এক পরমা সুন্দরী নারীর দেহলাবণ্য দর্শনে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কৌতুহলাক্রান্ত হয়ে তার পরিচয় জানতে তিনি যুবতীর নিকট উপস্থিত হলেন। পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন, কন্যাটির পিতা একজন ধীবর। তিনি এই অপরূপ লাবণ্যযুক্ত কন্যাকে এমন কঠোর কর্মে নিয়োগ করেছেন জেনে ব্যথিত হলেন। মনে মনে তিনি সেই নারীর প্রতি আসক্তও হয়ে পড়েন। রাজা শান্তনু যখন কন্যার পিতার কাছে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করলেন, তখন প্রত্যুত্তরে ধীবর বলেছিলেন-

অস্যাং জায়েত যঃ পুত্রঃ স রাজা পৃথিবীপতে।

ত্বদূর্ধ্বমভিষেক্তব্যো নান্যঃ কশ্চন পার্থিব।।[74]

অর্থাৎ তাঁর কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে তাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে হবে। এমন নির্মম প্রস্তাব শ্রবণ করে রাজা খুবই চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন এবং রাজধানীতে ফিরে এলেন। প্রণয়াসক্ত শান্তনু রাজকর্তব্য ভুলে দিনের পর দিন রুগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন দেবব্রত পিতার ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ধীবরকন্যা সত্যবতীকে নিজরাজ্য হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন এবং পিতার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। পিতার অভিলাষ অনুযায়ী কার্য করায় রাজা শান্তনু পুত্রের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, এবং কাঙ্ক্ষিত ধীবরকন্যাকে বিবাহের পর তিনি পুত্র দেবব্রতকে ইচ্ছামৃত্যুর বর দিলেন।

---

[74] মহা আদি ১০০। ৫৬

তচ্ছ্রুত্বা দুষ্করং কর্ম কৃতং ভীষ্মেণ শান্তনুঃ।

স্বচ্ছন্দমরণং তুষ্টো দদৌ তস্মৈ মহাত্মনে।।[75]

ন তে মৃত্যুঃ প্রভবিতা যাবজ্জীবিতুমিচ্ছসি।

ত্বত্ত্বো হ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য মৃত্যুঃ প্রভবিতানঘ।।[76]

পরবর্তীকালে ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর যথাক্রমে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। পূর্বপত্নীর প্রথম সাতটি পুত্রের গঙ্গায় বিসর্জনের মতো কর্ম অত্যন্ত নির্মম ও গর্হিত জেনেও রাজা কোনও প্রতিবাদ করতে পারেননি। এখানে শান্তনুর চারিত্রিক দৃঢ়তা যথেষ্ট খর্ব হয়েছে এবং পত্নীর প্রতি নিগূঢ় প্রেম সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রৈণরূপ ব্যক্ত হয়েছে।

ঋগ্বেদের রাজা শন্তনুর সংক্ষিপ্ত কথা মহাভারতে এইভাবে পল্লবিত হয়ে পরিণতি লাভ করেছে তা দৃষ্ট হয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির সামগ্রিক উপাদান মিলেই ভারতীয় পুরাকথার একত্ব প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বেদে বর্ণিত চরিত্রগুলিরই স্বাভাবিক বিবর্তন ঘটবে পরবর্তী সাহিত্যে বিস্তৃতিলাভ করবে এটা অযৌক্তিক কিছু নয়।

---

[75] মহা আদি ১০০ । ১০২

[76] মহা আদি ১০০। ১০৩

ধৃতরাষ্ট্র

কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠকসংহিতায় ধৃতরাষ্ট্রের নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বিচিত্রবীর্যের পুত্র বলে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

নৈমিষ্যা বৈ সত্রমাসত ত উত্থায় সপ্তবিংশতিং কুরুপঞ্চালেষু বৎসতরানবন্বত তান্বকো দালিভরব্রবীদ্যুয়মেবৈতান্ বিভজধ্বমিমমহং ধৃতরাষ্ট্রং বৈচিত্রবীর্যং গমিষ্যামি।[77]

মহাভারতে তিনি হলেন মহর্ষি ব্যাসের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠা পত্নী অম্বিকার গর্ভজাত সন্তান। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন অন্ধ। মহর্ষি ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে তিনি সমস্ত বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। যৌবনকালে পদার্পণ করলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এরপর তাঁর একশত পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। দুঃখের কারণ এই যে অন্ধত্বের কারণে তিনি রাজসিংহাসন লাভ করতে পারেননি। একারণে তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের জন্মের পরই অপর আত্মীয়বর্গকে জিজ্ঞাসা করেন, যে তাঁর এই পুত্র রাজা হতে পারবে কি না। এ বিষয়ে বিদুর প্রভৃতি বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের উক্তি ছিল-

ব্যক্তং কুলান্তকরণো ভবিতৈষ সুতস্তব।

তস্য শান্তিঃ পরিত্যাগে গুপ্তাবপনয়ো মহান্।। (মহা আদি ১১৫। ৩৬)

[77] কা সং ১০।৬।৯

-অর্থাৎ তোমার এই পুত্রটি বংশনাশক হবে। একে ত্যাগ করলে শান্তি হবে, আর ত্যাগ না করলে মহা অনিষ্ট উপস্থিত হবে। কিন্তু একথা জেনেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রকে ত্যাগ করলেন না।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। সেই ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। সংসারজীবনে তিনি আসক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই শান্তিলাভের উদ্দেশ্যে তিনি প্রকৃত বিধিপূর্বক কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। কুরু-পাণ্ডবদের বিদ্যাশিক্ষান্তে তিনি যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করেন।

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে যৌবরাজ্যায় পার্থিব।

স্থাপিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।।[78]

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ শৌর্যে-বীর্যে দেশ-বিদেশে নন্দিত, বন্দিত ও প্রশংসিত হতে লাগলেন। তাঁদের এই উন্নতি দেখে কৌরব ভ্রাতৃগণ ঈর্ষায় জ্বলে উঠলেন।

ততো বলমতিখ্যাতং বিজ্ঞায় দৃঢ়ধন্বিনাম্।

দূষিতঃ সহসা ভাবো ধৃতরাষ্ট্রস্য পাণ্ডুষু।।

স চিন্তাপরমো রাজা ন নিদ্রামলভন্নিশি।। [79]

তিনি মহামন্ত্রী কণিকের নিকট আপন মনস্কামনা জ্ঞাপন করলেন। তাঁর পর কণিকের উপদেশ অনুযায়ী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে গোপন মন্ত্রণা করলেন। তাঁরা স্থির

---

[78] মহা আদি ১৩৮।১

[79] মহা আদি ১৩৮।২৭

করলেন যে কোন উপায়ে পাণ্ডবকুলের ধ্বংসসাধন করতে হবে। সুতরাং জতুগৃহ নির্মাণ করে তাঁদের পুড়িয়ে মারার পরিকল্পনা করা হল। কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র কণিকের কথা শ্রবণ করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

কণিকস্য চ বাক্যানি তানি শ্রুত্বা চ সর্ব্বশঃ।

ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিধাচিত্তঃ শোকার্ত্তঃ সমপদ্যত।। [80]

তখন পুত্র দুর্যোধন নানা উপায়ে পিতাকে বশে আনার উপায় বার করলেন। সে কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে বললেন-

দুর্যোধন মমাপ্যেতদ্ধৃদি সম্পরিবর্ত্ততে।

অভিপ্রায়স্য পাপত্বান্নৈবং তু বিবৃণোম্যহম্।।

ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো ন চ ক্ষত্তা ন গৌতমঃ।

বিবাস্যমানান্ কৌন্তেয়াননুমংস্যন্তি কর্হিচিৎ।। [81]

অর্থাৎ দুর্যোধন, আমারও অভিপ্রায় সেরকম। কিন্তু এটা পাপ বলে প্রকাশ করতে পারছি না। এরপর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গোপন অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যে পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠানো হল। কিন্তু মহামতি বিদুরের চাতুর্যে পাণ্ডবরা বিপদ থেকে রক্ষা

[80] মহা আদি ১৪১। ২

[81] আদি ১৪১। ১৬, ১৭

পেলেন। তবে প্রচার করা হল যে পাণ্ডবগণ পুড়ে মারা গেছেন। তখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন কিন্তু বাইরে তিনি দুঃখ পেয়েছেন এরকম অভিনয় করলেন। বিললাপ সুদুঃখিতঃ। [82]

পাণ্ডবদের দ্রৌপদীলাভের কথা জানিয়ে একদিন বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, ভাগ্যক্রমে কুরুবংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল। রাজা শুনে আহ্লাদিত হয়ে ভাবলেন, তাঁর পুত্রই বুঝি কৃষ্ণাকে লাভ করেছে। পরে আসল সত্য জেনে মনে মনে কষ্ট পেলেও কাউকে তা বুঝতে দেননি। অতঃপর পাণ্ডবরা সকলে ফিরে এলে রাজা পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করতে পাঠালেন।

তারপর পাণ্ডবগণ আপন শৌর্যে বীর্যে বলবান হয়ে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলে সেখানে কুরুবংশীয়গণও উপস্থিত হলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের এই সৌভাগ্যের আতিশয্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। কীভাবে তাঁদের ক্ষতি করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি রুগ্ন হয়ে গেলেন। এমন সময় স্থির করা হল যে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করা হবে। তবে পুত্র দুর্যোধনকে দ্যুতক্রীড়া থেকে বিরত থাকতে শত চেষ্টা করেও তিনি বিফল হলেন। তাঁর এই মানসিক উদারতা কখনও অধিক হয়, আবার কখনও একেবারেই থাকে না। তাই বিপদে পড়লেই তিনি দৈবের অনিবার্যতার কথা বলেন। এভাবে যেন তিনি কিছুটা শান্তি ফিরে পান। এর মধ্যে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্মপথে অর্থাৎ সৎপথে আসার অনুরোধ করলেন। কিন্তু পত্নীর কথাতেও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ধর্মবুদ্ধি উদয় হল না।

[82] মহা আদি ১৫০। ১০

রাজা তাঁর পুত্রদের দুর্নীতির কথা চিন্তা করে অশান্ত হৃদয়ে দিবস রজনী কাটাতে লাগলেন।

একবার অশান্ত চিত্তে বিদুরের পরামর্শ নিতে গিয়েও স্বার্থান্বেষণকারী রাজা তাকে তিরস্কার করেন ও চলে যেতে বলেন। কিন্তু বিদুর পাণ্ডব-শিবিরে যোগ দিলে তাদের শক্তি অনেকাংশে বেড়ে যাবে এই আশঙ্কায় সঞ্জয়কে পাঠিয়ে তিনি বিদুরকে ফিরিয়ে আনলেন। ইতিমধ্যে বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল অতিবাহিত হলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রমাদ গুনলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা হল অন্যায়ভাবে পাওয়া অর্ধরাজ্য বিনা যুদ্ধেও যেন অপরিবর্তিত থাকে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র অর্জুনকে তথা ভীমকে যথেষ্ট ভয় করেন। তিনি বলেছেন—

ভীমসেনাদ্ধি মে ভূয়ো ভয়ং সংজায়তে মহৎ।

ক্রুদ্ধাদমর্ষণাত্তাত ব্যাঘ্রাদিব মহারুরোঃ ।।[83]

অর্থাৎ ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রকে হরিণ যেমন ভয় করে, আমিও তেমনই ভীমসেনকে ভয় পাই। কুরু এবং পাণ্ডবের যুদ্ধ হলে কৌরবদের পরাজয় নিশ্চিত, এই কথা ভেবে তিনি সঞ্জয়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের দূত হয়ে শান্তি-স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে কৌরবসভায় এলেন। তাঁকে নিজেদের পক্ষে লাভ করার জন্য অর্থ দ্বারা বশীভূত করবেন বলে বৃদ্ধ

[83] মহা উ ৫১ । ২

রাজা মনস্থির করলে বিদুর তাঁকে সতর্ক করে দেন। কৃষ্ণের শতচেষ্টা সত্ত্বেও শান্তি স্থাপন ব্যর্থ হল। প্রস্থানকালে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে বললেন— কৃষ্ণ, পুত্রদের উপর আমার কতটা প্রভাব আছে তা আপনি সবই প্রত্যক্ষ করলেন। আমি শান্তির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। সকলেই এটা জানেন যে, আমি সব সময় শান্তির জন্য তৎপর থাকি।

যুদ্ধের উদ্যোগ-সময়ে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত জনক। তাই তিনি সরল মনে আপন স্বার্থ স্বীকার করলেন।

স্বার্থে হি সংমুহ্যতি তাত লোকঃ।[84]

--সকলেই স্বার্থের নিমিত্ত মোহিত হয়ে থাকে।

কিন্তু কোনও উপদেশেই কাজ হল না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র দুর্যোধনকেই সমর্থন করলেন। ব্যাসদেবের অনুগ্রহে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করবেন বলে স্থির হল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র শুধু নিজের পুত্রদের পরাভবের কথা শুনেই যেন বিস্ময়ে মূর্ছাগ্রস্ত যান। তার পর স্বপক্ষীয় বীর যোদ্ধাদের মৃত্যুসংবাদে শোকাকুল হয়ে তিনি বিলাপ করেন—

কেনাবধ্যা মহাত্মানঃ পাণ্ডো পুত্রা মহাবলাঃ।

কেন দত্তবরাস্তাত কিং বা জ্ঞানং বিদন্তি তে।।[85]

---

[84] মহা ভী ৩। ৬০

[85] মহা ভী ৬৫।৫

ক্রমেই তিনি নিজের অপকর্মের কথা স্বীকার করতে শুরু করলেন। রাজ্যহারা, হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার ব্যাসদেব, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি সান্ত্বনা ও উপদেশ দিলেন। তাতে হয়তো কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেও পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর ঘৃণা একটুও কমেনি। যুদ্ধশেষে ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির তাঁকে যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন করলে তিনি ভীমকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন। কৃষ্ণের ছলনায় সেখানে লৌহভীম আনীত হলে বৃদ্ধ রাজা তাকেই প্রকৃত ভীম মনে করে সবলে আলিঙ্গন করে মূর্তি ভেঙে ফেললেন। তার পর তিনি নিজের কৃতকর্মের জন্যে বিলাপ করতে লাগলেন। এসময় শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

আত্মাপরাধাদাপন্নস্তৎ কিং ভীমং জিঘাংসসি। [86]

যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসে ধৃতরাষ্ট্রকে সমাদর করতে কার্পণ্য করেননি। তাঁর ব্যবহারে কোনও প্রতিকূলতা ধরা পড়েনি। আক্ষেপ করে ধৃতরাষ্ট্র বলেন, মহাত্মা বিদুরের কথা না শোনার ফলে তাঁর আজ এই দশা। কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা করতে থাকেন। সুযোগ পেলেই তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কথা শোনাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। এই ভাবে দিন চলতে থাকলে একদা তিনি সকলকে ডেকে বললেন—

বিদিতং ভবতামেতদ্ যথাবৃত্তঃ করুক্ষয়ঃ।

মমাপরাধাত্তৎ সর্ব্বমনুজ্ঞাতঞ্চ কৌরবৈঃ।। [87]

---

[86] মহা স্ত্রী ১৩। ৯

[87] মহা আশ্র ৩।১৭, ২৫

অর্থাৎ কুরুবংশ যেভাবে ধ্বংস হয়েছে তার মূল চক্রী হলাম আমি। সকল কৃতকর্মের জন্যে আমিই দায়ী। দুষ্টমতি দুর্যোধনকে যদি আমি ত্যাগ করতে পারতাম তাহলে আজ হয়তো আমাকে এই দুর্দিন দেখতে হত না। যোগ্য ব্যক্তিকে ন্যায্য ধনসম্পদ না দিয়ে যে অপরাধ তিনি করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত এখন করতে হচ্ছে। তাই তিনি এক কঠোর ব্রত অবলম্বন করলেন।

অন্ধরাজার কথা শুনে যুধিষ্ঠির খুবই বিচলিত হলেন, এমনকি তিনি রাজ্য ত্যাগের ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে মানসিক আশ্রয় দিয়ে আশ্বস্ত করলেন।

তাপস্যে মে মনস্তাত বর্ত্ততে কুরুনন্দন।

উচিতঞ্চ কুলেহস্মাকমরণ্যগমনং প্রভো।।

চিরমস্ম্যুষিতঃ পুত্র চিরং শুশ্রূষিতস্ত্বয়া।

বৃদ্ধং মামপ্যনুজ্ঞাতুমর্হসি ত্বং নরাধিপ।। [৪৪]

তিনি বললেন তাঁর মন তপস্যার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। যথকালে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করা আমাদের রাজবংশের ধর্ম। রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন, বহু বছর তোমার কাছে সেবা-শুশ্রূষা লাভ করে বাস করেছি। এখন আমার দেহে আর সেই বল বা শক্তি নেই, বেশি কথা বলা বা চলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছি। তাই প্রস্থানকালে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ ও মহামূল্যবান উপদেশ দিতে চাইলেন।

[৪৪] মহা আশ্র ৩। ৫৬, ৫৭

রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রজা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিজের ও পুত্রকৃত সমস্ত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে করুণ সুরে বললেন—

বৃদ্ধোহয়ং হতপুত্রোহয়ং দুঃখিতোহয়ং নরাধিপঃ।

পূর্ব্বরাজ্ঞাঞ্চ পুত্রোহয়মিতি কৃত্বানুজানথ।।

ইয়ঞ্চ কৃপণা বৃদ্ধা হতপুত্রা তপস্বিনী।

গান্ধারী পুত্রশোকার্ত্তা যুষ্মান্ যাচতি বৈ ময়া।। [89]

অতঃপর যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে মৃত আত্মীয়বর্গের বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করলেন।

তাঁর পর ধৃতরাষ্ট্র নির্দিষ্ট দিনে পূর্ণিমা তিথিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিয়োগপূর্বক যজ্ঞ করে পতিব্রতা স্ত্রীকে নিয়ে অরণ্যে গমন করলেন। তাঁর এই যাত্রায় কুন্তীও তাঁর সহগামিনী হলেন। অরণ্যযাত্রায় কুন্তী অগ্রে, তাঁর স্কন্ধে হাত দিয়ে গান্ধারী এবং তাঁর স্কন্ধে হাত রেখে রাজা ধৃতরাষ্ট্র চলতে লাগলেন। ভাগীরথী নদীর তীরে রাত্রিযাপন করে তাঁরা এরূপ কৃচ্ছ্রসাধন ব্রত পালন করতে লাগলেন যা দেখে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

একদিন মহর্ষি ব্যাসদেব সেই আশ্রমে এসে ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তশুদ্ধি হয়েছে কি না তা জানতে চাইলেন। তখন তিনি বলেন যে তাঁর মনে শান্তি নেই। তাঁর নিজের কুবুদ্ধিতেই প্রচুর প্রানহানি ও সম্পদহানি ঘটেছে। তাছাড়া মৃত্যুর পর তাঁরা এখন কোথায় কীরূপে আছে,

[89] মহা আশ্র ৯। ৮, ৯

তা জানতে চাইলেন তিনি। তখন তাঁর কথা শুনে ব্যাসদেব অলৌকিক প্রভাবে সকলকে এক রাত্রির জন্য মৃত আত্মীয়সমূহকে দেখালেন এবং আশঙ্কা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করলেন।

তার পর যুধিষ্ঠির একদা সপরিবারে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে এলেন। সেখানে কিছু দিন থাকার পর ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মাতা কুন্তীর স্নেহপূর্ণ আদেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর একদিন দেবর্ষি নারদ হস্তিনাপুর নগরীতে উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কাছে ধৃতরাষ্ট্রের সংবাদ জানতে চাইলেন। তখন নারদ বলেন যে তিনি ফিরে আসার পর কুন্তী প্রভৃতি সকলে গঙ্গাদ্বারে বসবাস করতে শুরু করেন। সেখানে একদা অরণ্যে অগ্নিসংযোগ হলে সেখানে আত্মাহুতি দিতে মনস্থির করলেন।

নৈষো মৃত্যুরনিষ্টো নো নিঃসৃতানাং গৃহাৎ স্বয়ম্। [90] -

সঞ্জয়কে এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সঙ্গে পূর্বাভিমুখ হয়ে যোগাসনে বসলেন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে জড়পদার্থের মতো নিশ্চল হয়ে রইলেন। বনের আগুন সহসা রাজা ও অপর দুজন স্ত্রীলোককে গ্রাস করে ফেলল। সঞ্জয় সেই দাবাগ্নি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নারদকে সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন।

তবে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যতই পাপ, অনিষ্ট, অপরাধ ও দুর্নীতিপরায়ণ হোন না কেন, অন্তিমকালে ঋষি ব্যক্তির মতো মৃত্যুবরণ করে তিনি তাঁর প্রকৃত চরিত্রকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কঠোর তপস্যাবলে তিনি শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন। তবে গান্ধারীর মতো পতিব্রতা

[90] মহা আশ্র ৩৭।২৭

ভার্যা লাভ করেও ধর্মবুদ্ধি ও হিংসা এই দুই বিপরীতমুখী শক্তির দ্বন্দ্বে তিনি কখনও সুখলাভ করতে পারেননি।

পরিক্ষিৎ

অথর্ববেদে কুরুবংশীয় রাজা পরিক্ষিতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য যো দেবোমর্হত্যা অতি।

বৈশ্বানরস্য সুষ্টুতিমা সুনোতা পরিক্ষিতঃ।।

পরিচ্ছিন্নঃ ক্ষেমমকরোৎ তম আসনমাচরন্।

কুলায়ন্ কৃণ্বন্ কৌরব্যঃ পতির্বদতি জায়য়া।

কতরৎ তে আ হরাণি দধি মন্থাং পরি শ্রুতম্।

জায়াঃ পতিং বি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ।।

অভীবস্বঃ প্র জিহীতে যবঃ পক্বঃ পথো বিলম্।

জনঃ স ভদ্রমেধতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ।। [91]

মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডববংশের একমাত্র বংশধর ছিলেন পরিক্ষিৎ। অন্যান্য পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিহত হলেও অভিমন্যু ও উত্তরার একমাত্র পুত্র পরিক্ষিৎ জীবিত

[91] অ সং ২০।৯।৩১।৭, ৮, ৯, ১০

রইলেন। পাণ্ডববংশীয় শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের পৌত্র ছিলেন তিনি। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির নামক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করা। নারদ, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষির অনুরোধেও তিনি সেই দিব্যাস্ত্র সংবরণ করতে পারেননি। উপায়ান্তর না দেখে অশ্বত্থামা ব্যাসদেবকে সবিনয়ে জানান, তিনি এই অস্ত্র শররূপে অভিমন্যুর ভার্যা উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি নিক্ষেপ করবেন।

ন চ শক্তোস্মি ভগবন্ সংহর্তুং পুনরুদ্যতম্।

এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজ্যামহম্।। [92]

কৃষ্ণ তখন ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বললেন, উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হলেও সে পুনর্জীবন লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে দীর্ঘজীবী হবে। হস্তিনাপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন কালে কৃষ্ণ সহ আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে পরিক্ষিৎ মৃতবৎ জন্মগ্রহণ করেন। তখন শোকাকুল সমগ্র রাজ্যে ক্রন্দনধ্বনি ওঠে। অবশেষে কৃষ্ণের কৃপায় পরিক্ষিৎ পুনর্জীবন লাভ করে। কৃষ্ণ পরিক্ষিতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির জন্যে বলেন—

যথা সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।

তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবতাদভিমন্যুজঃ।।[93]

অর্থাৎ আমি কখনও সত্য ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হইনি। তাই আমার সত্য ও ধর্মের বলে অভিমন্যুর পুত্র বেঁচে উঠুক।

---

[92] মহা সৌ ১৫।৩২

[93] মহা অশ্ব ৬৯।২২

কৃষ্ণের চেষ্টায় পরিক্ষিৎ পুনরায় জীবনলাভ করলেন। তাঁকে ফিরে পেয়ে সকলে অতিশয় আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণ প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তিনি তাঁর নামকরণ করলেন পরিক্ষিৎ।

পরিক্ষিণে কুলে যস্মাজ্জাতোয়মভিমন্যুজঃ।

পরিক্ষিদিতি নামাস্য ভবত্বিত্যব্রবীত্তদা।। [94]

অভিমন্যুর পুত্র লুপ্তপ্রায় বংশে জন্মগ্রহণ করেছে তাই তাঁর নাম হোক পরিক্ষিৎ।

পরিক্ষিতের অপর নাম ছিল বিষ্ণুরাত। তিনি বিষ্ণুর দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করেন তাই তাঁর এরূপ নামকরণ।

পরিক্ষিৎ শস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন গুরু কৃপাচার্যের নিকট থেকে। শস্ত্র ছাড়া তাছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্রেও তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন বলে জানা যায়।

রাজধর্মার্থকুশলো যুক্তঃ সর্বগুণৈর্বৃতঃ।।

জিতেন্দ্রিয়শ্চাত্মবাংশ্চ মেধাবী ধর্মসেবিতা।

ষড়্বর্গজিন্মহাবুদ্ধির্নীতিশাস্ত্রবিদুত্তমঃ।।[95]

তিনি মদ্রেশ্বর কন্যাকে মাদ্রবতীকে পত্নীরূপে লাভ করেন। তাঁর পুত্রের নাম হয় জনমেজয়।

---

[94] মহা অশ্ব ৭০।১২

[95] মহা আদি ৪৯।১৬

ভ্রাতাদের সঙ্গে মহাপ্রস্থানকালে যুধিষ্ঠির পরিক্ষিৎকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে মহাযাত্রা করলেন। বিবিধ গুণে গুণান্বিত রাজা পরিক্ষিৎ দক্ষতার সাথে রাজ্যশাসন করলেও শেষ জীবন তিনি দুঃখকষ্টে অতিবাহিত করেন। মৃগয়াসক্ত হওয়ার কারণে তিনি আত্মীয়বর্গের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করে অরণ্যে যান। সেখানে একদা একটি হরিণকে তীরবিদ্ধ করে তার পশ্চাদ্ধাবন করে অরণ্যমধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। ক্ষুধা ও পিপাসায় শ্রান্ত ক্লান্ত রাজা একজন মুনিকে দেখতে পেলেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যথোচিত ব্যবহার না পেয়ে ক্রোধে তাঁর গলায় একটি মৃত সর্প বেষ্টন করে দিয়ে চলে যান। সেই মুনির পুত্র যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি পিতার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে মহানাগ তক্ষকের দংশনে রাজার মৃত্যু হবে বলে অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপ থেকে পরিক্ষিৎ নিষ্কৃতি পাননি। রাজপ্রাসাদে থাকা সত্ত্বেও রাজা পরিক্ষিৎ তক্ষকনামক সর্পের দংশনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

জনমেজয়

অথর্ববেদে কুরুরাজ পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের উল্লেখও দেখা যায়। এই জনমেজয় আসন্দীব নামক স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অধ্যাপক রায়চৌধুরী অনুমান করেন অথর্ববেদোক্ত এই স্থানটি পরবর্তী কালের হস্তিনাপুর। তাঁর অনুমান বর্তমান থানেশ্বর, দিল্লি এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। [96]

মহারাজ পরিক্ষিতের চার পুত্রের মধ্যে অন্যতম হলেন জনমেজয়। পিতা পরিক্ষিৎ ও মাতা মাদ্রবতীর পুত্র পরিক্ষিৎ অল্প বয়সেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পত্নীর

[96] PHAI p. 20

নাম ছিল বপুষ্টমা। তাঁর দুই পুত্র হল যথাক্রমে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ। শতানীক বিদেহীরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র হলেন অশ্বমেধদত্ত।

জনমেজয়-ই মহাভারতের প্রথম শ্রোতা। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাকে মহভারত-কথা শোনান।

একদা ভ্রাতৃবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে জনমেজয় এক যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। সহসা সেখানে এক কুকুরের আগমন ঘটে। ভ্রাতৃগণ তাকে প্রহার করলে সেই কুকুর তার মায়ের কাছে যায়। সন্তানের দুঃখের কথা শুনে মাতা যজ্ঞস্থলে এসে ক্রুদ্ধস্বরে তার সন্তানকে প্রহারের উপযুক্ত কারণ দেখানোর দাবি করে। তার যুক্তি তার সন্তান যজ্ঞহবি দেখেওনি, লেহনও করেনি। তাহলে কেন তাকে প্রহার করা হল? তারপর সরমা জনমেজয়কে অভিশাপ প্রদান করলেন-

যস্মাদয়মভিহতোহনপকারী তস্মাদদৃষ্টং ত্বাং ভয়মাগমিষ্যতীতি। [97]

দেবকুক্কুরীর এই অভিশাপে চিন্তিত রাজা শাপনিবৃত্তির জন্য পুরোহিতের অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সোমশ্রবা নামে এক মুনিপুত্রকে শর্তসাপেক্ষে পৌরোহিত্যে বরণ করলেন।

বেদ নামে এক তপস্বী উপাধ্যায়কে রাজা জনমেজয় উপাধ্যায়ত্বে বরণ করেছিলেন। বেদের এক প্রিয় শিষ্য উতঙ্ককে গুরুদক্ষিণা দানের সময় মহানাগ তক্ষক অত্যন্ত ক্লেশ

[97] মহা আদি ৩। ৯

দিয়েছিলেন। উতঙ্ক প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে রাজা জনমেজয়ের রাজধানীতে এসে তাঁর পিতৃহন্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তক্ষকেন মহীন্দ্রেন্দ্র যেন তে হিংসিতঃ পিতা।

তস্মৈ প্রতিকুরুষ্ব ত্বং পন্নগায় দুরাত্মনে।। [98]

উতঙ্কের প্রতি দুর্ব্যবহারকারী তক্ষকই হল পরিক্ষিতের হত্যাকারী। উতঙ্ক তাই রাজা জনমেজয়ের প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে দিয়ে আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইলেন। মন্ত্রীদের মুখে পিতৃহত্যার কাহিনি সমস্ত অবগত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তাঁদের অনুমতি নিয়ে জনমেজয় সর্পসত্র অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হলে জনমেজয় আদেশ দেন অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন যজ্ঞস্থলে প্রবেশ না করে। যজ্ঞকালে মন্ত্রশক্তিতে সর্পকুল আগুনে দগ্ধ হতে লাগল। নাগরাজ বাসুকি চিন্তিত হলেন, তিনি কাতরস্বরে ভগিনীপুত্র আস্তীকের শরণাপন্ন হলেন।

তখন আস্তীক জনমেজয়ের দ্বারে উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশে স্তুতিগান আরম্ভ করলেন। স্তুতিশ্রবণে প্রীত হয়ে রাজা ব্রাহ্মণকে বর দিতে সম্মত হলেন। আস্তীক প্রার্থনা করলেন—

বরং দদাসি চেন্মহ্যং বৃণোমি জনমেজয়।

সত্রং তে বিরমত্বেতন্ন পতেয়ুরিহোরগাঃ ।।[99]

[98] মহা আদি ৩। ১৭৮-১৮৫

[99] মহা আদি ৫৬।২১

বর দিতে অনিচ্ছুক হলেও অবশেষে রাজা বর দিতে বাধ্য হলেন। যজ্ঞসমাপ্তির ঘোষণা করে তিনি বললেন—

যজ্ঞ সমাপন হোক, সর্পকুল সুখী হোক, আস্তীক প্রীত হন, সূত্রধারের বাণী সার্থক হোক। সকলকে প্রচুর দান করে রাজা স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারত অনুসারে কৃষ্ণ যদুবংশের শূরসেন বা বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতো মহাভারতেও তিনি নিত্যপুরুষ ভগবান।[100] মহাভারতে এই চরিত্র সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং জটিল। পাণ্ডবদের মাতা কুন্তী তাঁর পিতৃস্বসা এবং সেই সূত্রে তিনি তাঁদের পারিবারিক বন্ধু, রাজনৈতিক পরামর্শদাতা, সকল প্রকার বিপদে ত্রাতা, সর্ববিষয়ে সহায়ক এবং সকল সমস্যার সমাধানকর্তা। মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন এবং পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ও প্রীতির সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষে তিনি অর্জুনের রথের সারথি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি সখা অর্জুনকে যে উপদেশ প্রদান করেন তা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্রের সন্ধান দুর্লভ নয়, মহাভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির মতো কৃষ্ণও ধরা দেন আমাদের দৃষ্টিপথে ঠিক যেভাবে ভক্ত তাঁকে খুঁজে পান আপন হৃদয়ের মধ্যে। ঋগ্বেদে কৃষ্ণ একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং তাঁর পরিচয় আঙ্গিরস কৃষ্ণ[101]। তিনি

---

[100] ভগবান্ বাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেত্র সনাতনঃ (মহা, আদি ১।২৫৬)।

[101] ঋ সং ৮।৮৫।

যাদববংশীয় কৃষ্ণ কি না তা সর্ববাদিসম্মত নয়, তবে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত আঙ্গিরস শব্দটি পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ের সঙ্গে ক্ষীণভাবে হলেও যুক্ত। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে[102] কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তাঁর পরিচয় দেবকীপুত্র কৃষ্ণ, যে পরিচয় মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে দেখা যায় তিনি ঘোর আঙ্গিরসের নিকট থেকে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করছেন। এই উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে যে উপদেশ প্রদান করেছেন তারই তুল্য। এই তত্ত্ব শ্রবণে কৃষ্ণ সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে[103] এই উপদেশের সমর্থনে দুটি ঋঙ্মন্ত্রের[104] উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সেখানে যা বলা হয়েছে তাঁর মর্মার্থ হল- যে জ্যোতি পরব্রহ্মে দীপ্তিলাভ করে ব্রহ্মবিদ্গণ জগতের বীজরূপী এবং দিবালোকের মতো সর্বব্যাপী পুরাতন ও জগৎকারণ সেই পরমজ্যোতি দর্শন করেন। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তাঁকে নিজের হৃদয়ে নিহিত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দেখে আমরা দেবতাদের মধ্যে দ্যুতিমান পরমেশ্বর সর্বোত্তম জ্যোতিকেই লাভ করেছি। অনুমান করা যেতে পারে ঘোর আঙ্গিরস এই তত্ত্বোপদেশের একজন প্রবক্তা যার কাছ থেকে কৃষ্ণ এই শিক্ষা লাভ করেন। সেই সঙ্গে এও অনুমেয় যে এই কৃষ্ণই যাদববংশীয় কৃষ্ণ যিনি দেবকী ও বসুদেবের পুত্র।

---

[102] তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব সোন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিতমস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ (ছা উ ৩।১৭।৬)।

[103] ছা উ ৩।১৭।৭

[104] ঋ সং ৮।৬।৩০; ১।৫০।১০

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে আঙ্গিরস কৃষ্ণ অশ্বিযুগলের উদ্দেশে স্তুতি করেছেন। দেবতাদ্বয়ের প্রতি তাঁর আহ্বান-

অয়ং বা কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ।

মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।[105]

অর্থ হল- হে অন্নযুক্ত ধনবান অশ্বিযুগল, মদকর সোমপানার্থে এ কৃষ্ণ ঋষি আপনাদের আহ্বান করছেন।

একই সূক্তের অন্য একটি মন্ত্রে অনুরূপ আহ্বান-

শৃণুতং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরা।

মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।| [106]

অর্থাৎ হে নেতৃদ্বয়, স্তোত্রশীল স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোমপানার্থে শ্রবণ করো।

সমগ্র সূক্তেই অশ্বিদেবতাযুগলের উদ্দেশে মত্ততাজনক সোমরস পানার্থে কৃষ্ণের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনিত। এখানে পরিলক্ষিত হয় যজ্ঞস্থলে আসার জন্যে ঋষি কৃষ্ণের আন্তরিক আবেদন। বর্ষণ, ধন ও অন্নের দাতা দেবতার প্রতি আনুষ্ঠানিক স্তুতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

---

[105] ঋ সং ৮।৮৫।৩

[106] ঋ সং ৮।৮৫।৪

ঋগ্বেদের অন্য একটি সূক্ত[107] কৃষ্ণের অন্য একটি পরিচয় তুলে ধরে। এখানে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধিতা ও সংঘর্ষের কথা পরিলক্ষিত হয়। জানা যায় কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্যের অধিকারী এবং তিনি দ্রুত গমনকারী।

অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।

আবত্তমিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্তমপঃ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত।।[108]

ইন্দ্রের পর্যবেক্ষণে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে কৃষ্ণের অবস্থান এবং সেখানে তিনি সূর্যের মতো বিরাজমান। তিনি মরুদ্গণকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করছেন। ঋষিকবির বর্ণনায় দেখা যায়-

দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরন্তমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।

নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ।

অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেধারয়ত্তন্বং তিত্বিষাণঃ।

বিশো অদেবীরভ্যা চরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্রঃ সসাহে।।[109]

ঋগ্বেদের এই সূক্ত এবং কয়েকটি পুরাণে প্রাপ্ত বিবরণ পর্যালোচনা করে ধর্মানন্দ কোসাম্বী মনে করেন, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সামান্য গোপালক রাজা ছিলেন। ভারতের সপ্তসিন্ধু দেশে আর্যদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁদের নেতা ইন্দ্র পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু মধ্যভারতে তিনি কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ইন্দ্রের

---

[107] ঋ সং ৮।৯৬

[108] ঋ সং ৮।৯৬।১৩

[109] ঋ সং ৮।৯৬।১৮, ১৫

আধিপত্য মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে উভয়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। কৃষ্ণের সৈন্যদলে অশ্বারোহী না থাকলেও ইন্দ্রের যুদ্ধকৌশল কৃষ্ণের ক্ষতিসাধন করতে পারল না। উত্তম ও সুরক্ষিত যুদ্ধক্ষেত্র নির্বাচন করে কৃষ্ণ তাঁর যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় দিলেন। ইন্দ্র ওই যুদ্ধে বৃহস্পতির সাহায্য নিয়ে কোনওরকমে প্রাণরক্ষার জন্যে পশ্চাদপসরণ করলেন। ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় বলে কোসাম্বী মনে করেছেন।[110]

মহাভারতে প্রথম কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় পাঞ্চালনগরে অনুষ্ঠিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায়। তিনি অর্জুনের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর একটি বীক্ষণশক্তির অনন্য পরিচয় এই যে একমাত্র তিনিই ভস্মমাখা ছদ্মবেশধারী পঞ্চপাণ্ডবকে চিনতে পেরেছিলেন।

কৃষ্ণ একদিন পাণ্ডবগণের গোপন বাসস্থান খুঁজে পেলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন—

গূঢ়োহপ্যগ্নির্জ্জায়ত এব রাজন্। [111]

হে রাজন্, অগ্নি গোপনে থাকলেও তা প্রকাশ পায়।

এখানে কৃষ্ণের আত্মীয়প্রীতি ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্য গভীর।

---

[110] ভগবান বুদ্ধ, পৃ ৯।

[111] মহা আদি ১৯১। ২৩

রাজসূয় যজ্ঞকালে রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ সেখানে যথোচিত উপদেশ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। কৃষ্ণসর্বদা বৃহত্তর স্বার্থে জগতের কল্যাণের কথা ভাবেন। কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন, ভীম ও কৃষ্ণ সকলে মগধরাজ্যে এলেন জরাসন্ধের মোকাবিলা করার জন্যে। সেখানে এসে তাঁরা তাঁদের অভিসন্ধির কথা সরাসরি রাজা কে জানালেন।

ত্বামাহ্বয়ামহে রাজন্ স্থিরো যুধ্যস্ব মাগধ।

মুঞ্চ বা নৃপতীন্ সর্ব্বান্ গচ্ছ বা ত্বং যমক্ষয়ম্।। [112]

কৃষ্ণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে রাজা জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে নিহত হন। পাণ্ডবগণ এরপর বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্ত করে স্বরাজ্যে ফিরে যান। রাজসূয়সভায় কাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করা হবে এই প্রশ্নে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণেরই উল্লেখ করলেন। ভীষ্মের আদেশে কৃষ্ণকে সহদেব অর্ঘ্য প্রদান করলে চেদিরাজ শিশুপাল ক্রুদ্ধ হয়ে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। শিশুপালের মতে যেহেতু কৃষ্ণ পুরোহিত বা রাজা নন, তাই শুধু তাঁকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া এই সম্মানজ্ঞাপনের অন্য কোনও কারণ নেই। তখন ভীষ্ম কৃষ্ণকে দেবতারূপে বর্ণনা করলেন। তাঁর কথায় কৃষ্ণের যে শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

এরপর নানা বাদানুবাদের পর কৃষ্ণ শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদ করে তাঁকে হত্যা করলেন।

---

[112] মহা সভা ৪২। ২৬

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবগণ বনবাস অবলম্বন করেছেন। তা দেখে কৃষ্ণ বিচলিত হয়ে বলেছেন—

মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।

যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু।।

নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ হরির্নারায়ণো হ্যহম্।

কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নরনারায়ণাবৃষী।।[113]

কৃষ্ণের এই উক্তিতে তাঁর যে অর্জুনপ্রীতি কত গভীর তা প্রকাশিত হল।

পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী কৃষ্ণকে অনুযোগ প্রকাশের উত্তরে তিনি বলেন—

যৎ সমর্থং পাণ্ডবানাম্ তৎ করিষ্যামি মা শুচঃ।

সত্যং তে প্রতিজানামি রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি।। [114]

অর্থাৎ পাণ্ডবগণের যাতে কল্যাণ হয়, কৃষ্ণ তা-ই করবেন। দ্রৌপদী যেন কোনও চিন্তা না করেন, যথাসময়ে তিনি রাজগণের রাজ্ঞী হবেন।

তিনি দ্বারকায় ফিরে গেলেন।

---

[113] মহা বন ১২। ৪৫, ৪৬

[114] মহা বন ১২। ১২৭

দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে কৃষ্ণই তাঁর লজ্জানিবারণ করেন। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের পর কৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে বিরাট নগরে নিয়ে যান। সহসা কৃষ্ণ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

এবং গতে ধর্ম্মসুতস্য রাজ্ঞো।

দুর্যোধনস্যাপি চ যদ্ধিতং স্যাৎ।।

তচ্চিন্তয়ধ্বং কুরুপাণ্ডবানান্।

ধর্ম্ম্যঞ্চ যুদ্ধঞ্চ যশকরঞ্চ।। [115]

শান্তিস্থাপনের জন্যে শুচি ও কুলীন ব্রাহ্মণকে দিয়ে দুর্যোধনের কাছে বার্তা পাঠাতে চাইলে বলরাম কৃষ্ণের এই প্রস্তাবে বাধা দেন। কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেই কৃষ্ণকে স্বদলে পাবার জন্য পরামর্শ চলতে লাগল। অর্জুন ও দুর্যোধন উভয়েই কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য দ্বারকায় গিয়ে নিদ্রিত কৃষ্ণের জাগ্রত অবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণ আগে পায়ের কাছে অর্জুনকে দেখেন এবং পাণ্ডবপক্ষেই যোগ দেবেন বলে জানালেন। অর্জুনের দীর্ঘদিনের বাসনা ছিল পরম মিত্রবর কৃষ্ণকে রথের সারথি রূপে পাওয়ার। তাঁর সেই বাসনাও পূর্ণ হল। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের কাছে সারথির কাজ নিন্দনীয়। তবুও এই কাজে তিনি এতে কোনও সংকোচ প্রকাশ করলেন না। এখানে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বই প্রকাশিত হল।

[115] মহা উ ১। ১৩, ১৪

মহাভারতে মহাযোদ্ধা হিসাবেও কৃষ্ণকে দেখা যায়। তিনি পাণ্ড্য, ভোজ, বারাণসী প্রভৃতি দেশের রাজাদের যুদ্ধে জয় করেছেন। বহু বীরপুরুষ তাঁর হাতে নিহত হয়েছেন। প্রবাদ আছে, সূর্যকে যেমন ঢেকে রাখা যায় না, অগ্নিকে যেমন হাত দিয়ে নেভানো যায় না, তেমনি কৃষ্ণকেও যুদ্ধে জয় করা একপ্রকার যে অসম্ভব তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তবু এই নিতান্ত অসাধ্য কাজ দুর্যোধন সাধন করবেন বলে মনে করছেন। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাবে বোঝা গেল যুদ্ধ ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ মাত্র পাঁচগ্রাম চেয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে যাকে, সে শান্তি চাইলেও সম্ভব নয়। তাই রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন— কৃপা করে আমাদের অসহায়তা দূর করুন।

কৃষ্ণ বললেন, শান্তি-স্থাপনে যদি সফল না হই, তবে ঘোর যুদ্ধে সমগ্র কৌরববংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ এখন দুর্যোধনের মনোভাব হল- 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। যে কোনও প্রকারে তিনি ঘোর যুদ্ধের পরিপন্থী। কৃষ্ণ শান্তি বার্তা নিয়ে গেলেও তিনি তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করা তো দূরের কথা, নানা অছিলায় অপমান করবেন। তবু সমস্ত কিছু কৃষ্ণের উপর ছেড়ে দিয়ে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, যা হয় হবে, তবু একবার শান্তি স্থাপনের বার্তা নিয়ে যাওয়া উচিত। তাতে যদি কোন অঘটন ঘটে তো ঘটুক, তবুও ের ফলে দুর্যোধনের প্রকৃত মনোভাব জানা সম্ভব হবে।

তখন সকলের শুভকামনা নিয়ে কৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কয়েকজন বীরপুরুষ সহ কৌরবসভার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সেখানে যাওয়ার পর দুর্যোধন ছাড়া সকলেই তাঁকে যত্নের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির সঙ্গে এমনকী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর সাথে আন্তরিক ব্যবহার করেন। তার পর কৃষ্ণ

দুর্যোধনের প্রাসাদে গমন করলে সেখানে উপস্থিত সকলে তাঁকে যথোচিত সমাদর জ্ঞাপন করে রাত্রিতে অবস্থানের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কৃষ্ণ তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন—

কৃতার্থা ভুঞ্জতে দূতাঃ পূজাং গৃহ্নতি চৈব হ।

কৃতার্থং মাং সহামাত্যস্ত্বমর্চ্চিষ্যসি ভারত।। [116]

অর্থাৎ দূতের কার্য সফল হলেই সৎকার গ্রহণ করা উচিত। কৃষ্ণের এ কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে দুর্যোধন আবার বললেন, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর কোনও বৈরিতা নেই, তাই তাঁর এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান উচিত হয়নি। কৃষ্ণ তখন বললেন—

যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু।

ঐক্যত্ম্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ।। [117]

পরিকল্পনা মতো বিদুরের গৃহে বিশ্রামকালে কথোপকথন চলাকালীন কৃষ্ণ বললেন—

জ্ঞাতীনাং হি মিথো ভেদে যন্মিত্রং নাভিপদ্যতে।

সর্বযত্নেন মধ্যস্থং ন তন্মিত্রং বিদুর্বুধাঃ।। [118]

আত্মীয়দের কলহের সময় উভয়পক্ষের মিত্র হয়েও যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বের মেটানোর চেষ্টা করেন না, তাকে প্রকৃত বন্ধু বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

---

[116] মহা উ ৯১। ১৮

[117] মহা উ ৯১।২৮

[118] মহা উ ৯৩।১৫

পরদিন সকালে উপস্থিত সভাসদবর্গের নিকট আসন গ্রহণ করে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদি নীতির প্রয়োগ করেও কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বশে আনতে পারলেন না। এর পর কর্ণকে নানাবিধ প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও তাঁকেও দুর্যোধনের পক্ষ থেকে সরাতে পারলেন না।

এরপর আর যুদ্ধ ছাড়া আর করণীয় কিছু রইল না। কারণ কৃষ্ণ শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী হলেও যুদ্ধক্ষত্রে কাপুরুষ নন।

অবশেষে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। কুরুপক্ষে উপস্থিত যোদ্ধাদের দেখে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর সেই বিষণ্ণতা দূর করার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ অর্জুনকে তত্ত্বোপদেশ শুনিয়ে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করেন।

তবে একসময়ে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতির পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের তৃতীয় দিন ভীষ্মের প্রতাপে যখন অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্য নিহত হয়ে পড়ছিল, তখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র হাতে তাঁর দিকে ধাবিত হলেন। কৃষ্ণের পক্ষে এহেন আচরণ নিতান্তই বিস্ময়কর।

পাণ্ডবপক্ষের সাথে তাঁর কীরূপ হৃদ্যতা ছিল তা মহাভারতের একটি শ্লোক থেকে জানা যায়—

যঃ শত্রুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং মচ্ছত্রুঃ স ন সংশয়ঃ।

তব ভ্রাতা মম সখা শিষ্য এব চ।

মাংসান্যুৎকৃত্য দাস্যামি ফাল্গুনার্থে মহীপতে।।[119]

[119] মহা ভী ১০৭।৩২ ক, ৩৩

কৃষ্ণ একথাও বলেন, পুজনীয় গুণবান ব্যক্তি যদি পরম শত্রুরূপে আক্রমণ করেন, তবে তাঁকে অবশ্যই প্রতি-আক্রমণ করা উচিত।

অভিমন্যুবধের কথা শ্রবণ করে কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ না করেই অর্জুন ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, জয়দ্রথকে বধ করতে না পারলে তিনি আগুনে আত্মাহুতি দেবেন। একথা শুনে কৃষ্ণ মহা সমস্যায় পড়লেন। তখন তিনি এক উপায় অনুসন্ধান করলেন। কৃষ্ণের ছলনায় কৌরবদের বুদ্ধি বিপথে চালিত হল। অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেন।

ইতিমধ্যে ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেও কৃষ্ণার্জুনের আনন্দ দেখে তাঁরা স্তম্ভিত হলেন। সকলের সংশয় নিরসনে কৃষ্ণ বললেন—

যে হি ধর্মস্য লোপ্তারো বধ্যাস্তে মম পাণ্ডব।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞৈষা মমাব্যয়া।। [120]

অর্থাৎ যারা ধর্মবিদ্বেষী তারা আমার বধ্য। ধর্মসংস্থাপনের জন্যেই আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, তার অন্যথা কখনও হবে না।

কিন্তু দ্রোণকে বধ করা অসম্ভব হল। তখন শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে যুধিষ্ঠিরের চাতুর্যে দ্রোণ নিহত হলেন।

[120] মহা দ্রো ১৭৯। ২৮, ২৯

কর্ণবধের জন্য কৃষ্ণ নানা উপায়ে অর্জুনকে উত্তেজিত করেছেন। অবশেষে অর্জুন কর্ণের মস্তক ছেদ করলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধে ভীম তাঁর ঊরুভঙ্গ করেন।

এতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণের শঠতা অবলোকনকারী দুর্যোধন একে একে সব বললে কৃষ্ণ স্থির ভাবে তাঁকে বললেন—

যান্যকার্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে।

বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্ব্বং হি তদনুষ্ঠিতম্।। [121]

.....

[121] মহা শল্য ৬১। ৪৭

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বৈদিক সাহিত্যে মহাভারতের বীজ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় উভয় গ্রন্থের নানাবিধ সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেদ এমনই একটি গ্রন্থ যার সঙ্গে পরবর্তী কালে রচিত সমস্ত শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ দেখা যায়। হতে পারে কখনও সেই যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট, কখনও বা পরোক্ষ, আবার কখনও তা অস্পষ্ট বা ক্ষীণ । তাই বেদ সম্পর্কে পরম্পরাগত ধারণার কথা ছেড়ে দিলেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারেও বেদের গুরুত্ব বিন্দুমাত্রও কমে না। বেদানুসারী গ্রন্থে তো বেদের গুরুত্ব থাকবেই, বেদের তত্ত্বের বিরোধী শাস্ত্রও বেদের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, আস্তিক দর্শন, নাস্তিক দর্শন, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিষয়ক গ্রন্থ- ভারতীয় মনীষার যে কোনও ক্ষেত্রে বেদের গুরুত্ব, মহত্ত্ব বেদের ভূমিকা অপরিহার্য।

বেদ শ্রুতি আবার মহাভারত স্মৃতির অন্তর্গত। মহাভারতকে আধুনিক মনীষীরা মহাকাব্য বলেন। গ্রন্থ হিসাবে আকৃতিতে বড় আর বিষয়ে ভারী তো বটেই, কাব্য হিসাবেও অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী তা আর্ষ মহাকাব্য হিসাবে গণ্য। তাই তার মহাকাব্যত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু শুধুমাত্র মহাকাব্য বললে মহাভারতের গভীরতা আর ব্যাপ্তি কিছুই বোঝানো যায় না। তাই এই মহাগ্রন্থের আখ্যা কারও কাছে ইতিহাস, কারও কাছে পুরাণ আবার কারও কাছে ধর্মশাস্ত্র।

বেদের সঙ্গে মহাভারতের সম্পর্ক বলতে গিয়ে প্রথমেই বলা যায় যে এই দুই গ্রন্থ ভারতবাসীর জনমানসে পাশাপাশি অবস্থান করে। তবে বেদ তাঁদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হলেও তা রহস্যময়, তাঁর সঙ্গে সকলের সাবলীল পরিচয় নেই এবং তা সহজে আয়ত্তের বিষয়ও নয়। সকলের অধ্যয়নেরও অধিকার নেই। কিন্তু মহাভারত আমাদের অতি নিকটবর্তী, অতি সহজে আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অনুভব করতে পারি। আর এই দুই গ্রন্থের নিজেদের সম্পর্ক বলতে গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে করা যায় যে বেদ মহাভারত কেন, অন্য কারও অপেক্ষা করে না। কিন্তু মহাভারত সহ অন্য সমস্ত শাস্ত্র বেদের অপেক্ষা রাখে। আপাতদৃষ্টির কথা বললাম এই কারণে যে বেদার্থ জানতে গেলে কিন্তু বেদাঙ্গ তো বটেই ইতিহাস বা পুরাণের প্রয়োজন হবেই। চোখ ছাড়া যেমন বিশ্বজগৎ অন্ধকার, বেদাঙ্গ ব্যতিরেকে তেমনই বেদের অর্থ আমাদের অগোচরই থেকে যায়।

তাই মহাভারতেই বলা হয়েছে যে-

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

বিভেত্যল্পশ্রুতত্বাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।| [122]

সুতরাং বেদার্থ অনুধাবনের জন্যে ইতিহাস পুরাণ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে বই কী। স্বল্পজ্ঞানীকে বেদ ভয় পায় এই ভেবে যে সে তাঁকে প্রহার করতে পারে। অর্থাৎ সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বেদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নন, যিনি বহু অধ্যয়ন করেছেন,

[122] মহা আদি ১।২৬৯

ইতিহাস পুরাণ যাঁর অধিগত, তিনিই বেদের যথার্থ বক্তব্য ওই শাস্ত্রসমূহের জ্ঞান দ্বারা অর্জন করতে পারেন। স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তি বেদের গূঢ়ার্থ না বুঝে ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন।

বেদার্থ জানার জন্যে ছয় বেদাঙ্গের মতো পুরাণাদি চতুর্দশ বিদ্যার জ্ঞানও আবশ্যক। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন-

পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।

বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।।[123]

এখন একটু দেখে নেওয়া যাক অন্যান্য শাস্ত্রগুলি বেদবিষয়ে কতটা প্রাসঙ্গিক।

বেদ ও উপনিষদে বিভিন্ন বিদ্যার তালিকায় নানাবিধ নাম একসঙ্গে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে (১১।৫।৬৮) ইতিহাস, পুরাণ, গাথা নারাশংসী শব্দগুলির একত্র উল্লেখ থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে, এগুলি প্রাচীন ইতিহাসের মৌল উপাদান ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪।৩।১২-১৩) ইতিহাস বেদ ও পুরাণ বেদ পাঠের একত্র উল্লেখ আছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে ইতিহাস বলতে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যায়িকা ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। আবার মহাভারত ও পুরাণ একসাথে ইতিহাস নামে প্রসিদ্ধ। অমরকোষে (১।৬।৪-৫) ইতিহাস হল পুরাবৃত্ত। তবে মহাভারত শুধু ইতিহাস-পুরাণ নয়। এককথায় একে ভারতকোষ বলা যায়।

মনুসংহিতাকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। এই ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন সমাজকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে চলেছে। চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা যেমন এই গ্রন্থে আছে তেমনি বেদেও

[123] যা সং ১।৩

পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি বলেছেন- মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদিধি – দূরে নৈষ্ট পরাবতঃ। অর্থাৎ আমরা যেন কখনও আমাদের পিতৃপুরুষ মনুর নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে না যাই। মহাকবি কালিদাসও তাঁর রঘুবংশ মহাকাব্যে বলেছেন- আ মনোর্বত্মনঃ – ক্ষুণ্ণম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ সূর্যবংশের কেউই মনুর পথ থেকে সরে যাননি। নারদ, ঋষি গৌতম, বশিষ্ঠ, বৃহস্পতি ও বিশেষ করে মহাভারতকার মনুর কাছ থেকে তাঁদের ঋণ স্বীকার করেছেন। এবং সকলেই তাঁর প্রতি সমধিক প্রশংসা করেছেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে-

পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।

সুতরাং অনুমেয় হয় যে মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্র প্রাচীন।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে যে বিদ্যার শাখাকে বুঝি, তারই অপর নাম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। অপর নামগুলিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। দণ্ডনীতি, রাজনীতি বা নীতিশাস্ত্র। আবার বৈদিক যুগেই এরনাম হল ক্ষাত্রবিদ্যা। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির আচরণীয় যে বিদ্যা। মহাভারতে বলা হয়েছে- ব্রাহ্মণেরা যেমন বেদের জ্ঞানের উপর, পত্নী পতির উপর, তেমনি রাজাও একান্তভাবে মন্ত্রীর উপরনির্ভরশীল। মনুসংহিতায় স্বয়ং মনু বলেছেন, সহায়বিহীন রাজার পক্ষে সমৃদ্ধিশালী দেশ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কষ্টের। তাই মন্ত্রীর সহায়তা একান্ত অপরিহার্য।

ঋগ্বেদে মন্ত্রীর উল্লেখ নেই। এমনকি অথর্ববেদেও নেই। তাই বলে রাজতন্ত্র সম্পর্কিত এমন কোনও কথা নেই এমনটা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ সেখানে রাজকৃৎ শব্দটি প্রাপ্ত

হয়। তবে এ কথাটি রাজা বা মন্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কিনা সে বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য বর্তমান। যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণগুলিতে এক শ্রেণীর উচ্চ রাজকর্মচারীর উল্লেখ রয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের সূচনার সাক্ষর ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বেদের মন্ত্র-কবিতায় গম্ভীর ও বিচিত্র ভাবনার উদ্ভব দেখা যায়। বৈদিক কবি মনীষীর অন্তর্দৃষ্টির যে আকূতি তাই দর্শনতত্ত্ব সৃষ্টির প্রধান সোপান। ভারতীয় অধ্যাত্ম ও লোকায়ত চিন্তাভাবনার সার্বিক রূপ প্রতিবম্বিত হয়েছে প্রধান দুটি স্তরে। প্রথমত- শ্রুতি শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ বৈদিক সাহিত্য ও তার অনুগত পরম্পরা এবং দ্বিতীয়ত স্মৃতি শব্দের দ্বারা মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র ও তদনুগত পরম্পরা নির্দেশ করা হয়। এর মধ্যে শ্রৌত দর্শন মতে বিশ্বাসী মানুষ বৈদিক ঐতিহ্যের অনুগামী। তাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেও যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁরা বেদকে শব্দ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। বেদবাক্যকে তাঁরা অপৌরুষেয় অভিধায় অলঙ্কৃত করেন।

ভারতীয় দর্শন আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। আস্তিক ও নাস্তিক এই দুটি শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বৈয়াকরণ পাণিনিসূত্রের (৪।৪।৬০) ব্যাখ্যা করেছেন আচার্য ভট্টোজি দীক্ষিত। অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ = অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ, নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ । তবে বেদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রই যে ঈশ্বরবিষয়ে বিশ্বাসী হবেন তা নিশ্চিত নয়। ভারতীয় দর্শনের চিন্তায় চারটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। এক কর্মকাণ্ডের যুগ। সেখানে একাধিক দেবতাবাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুই জ্ঞানকাণ্ডের যুগে। সেখানে মানুষের মনে সৃষ্টিকে নিয়ে নানা প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছিল। তিন- ষড়দর্শনের যুগ। মানুষ সেই সময় দুঃখকে পরিত্যাগ করতে নয়, বরং পৃথিবীর মায়া-বন্ধন থেকে

মুক্তিলাভ করতে চেয়েছিল। চার- পুরাণের যুগ। তখন মানব-মনে ঈশ্বর কল্পিত হয়েছে ও দিকে দিকে ভক্তিভাবের তত্ত্ব বিস্তৃতিলাভ করেছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় বেদ ভারতীয়দের জীবনে শীর্ষস্থানে অবস্থিত। আবার বেদপরবর্তী সমস্ত কিছুই বেদকেন্দ্রিক। ইতিহাস পুরাণ ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কোনও অমূলক আকস্মিক সৃষ্টি নয়। তাই মহাভারতও বেদবাণীরই প্রকাশ। বেদ কখনই থেমে থাকার নির্দেশ দেয়নি। বরং এগিয়ে চলারই মন্ত্রণা দিয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' তারই সাক্ষ্য দেয়। মহাভারতের কথা তাই কাল্পনিক নির্মাণ নয়, বৈদিক ভারতেরই কথা। শুধু ভরতবংশীয় রাজাদের কথাই নয়, সমগ্র ভারতের জনগণেরই কথাই মহান আকারে ধরা দিয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে।

.....

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

।। মূল গ্রন্থসূচী।।

অষ্টাধ্যায়ী । তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য. (সম্পা.)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪।

উপনিষদ । অতুল চন্দ্র সেন. (সম্পা.)। কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৫ (১৯৭২)।

ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রম । গুরুশঙ্কর মুখোপাধ্যায়.(সম্পা.)। কলিকাতা: শীর্ষেন্দু প্রকাশন, ১৯৭৬।

কাঠকসংহিতা । স্বাধ্যায় মণ্ডল, মুম্বাই, ১৯৪৩।

নিরুক্ত । অমরেশ্বর ঠাকুর. (সম্পা.)। কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭।

নিরুক্ত । তারকনাথ অধিকারী. (সম্পা.)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২।

বৃহদ্দেবতা । রামরতন রাই.(সম্পা.)। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ২০০৩. (৩য়. সংস্করণ)।

মনুসংহিতা । অশোকনাথ শাস্ত্রী.(সম্পা.)। কলিকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৬২।

মহাভারতম্ । শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য. (সম্পা.) । কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৪০ (বঙ্গাব্দ)।

বেদ, শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী (অনু.ও সম্পা.)। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহ । বলদেব উপাধ্যায়। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৫৮।

Rgveda. Ed. Visva Babdhu, Hoshiarpur: Visvesvarananda Vedic Research Institute, 1965.

Brhaddevata (Part II), Ed. Arthur Anthony Macdonell, Delhi: Motilal Banarsidass, 1965 (1904).

।। সহায়ক গ্রন্থসূচী।।

কৌশাম্বি, ধর্মানন্দ। *ভগবান বুদ্ধ.* নিউ দিল্লী: সাহিত্য একাডেমি ১৯৮০।

চৈতন্য, জে.এল. গুপ্ত। *ষড়্দর্শনসংগ্রহ.* দিল্লীঃ চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান ২০০৪।

দত্ত, রমেশচন্দ্র। *হিন্দুশাস্ত্র.* কলিকাতা : নিউ লাইট, ১৪০৮ (১৩০০)।

ধর্মপাল গৌরী। *বেদ ও শ্রী অরবিন্দ* । কলিকাতা: শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০০৬ (১৯৮১)।

বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ। *মহাভারত.* কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৮।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা* । কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩।

বসু, অনিলচন্দ্র। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* । কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৯৯।

বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়* । কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩।

বসু, গিরীন্দ্রশেখর। *পুরাণপ্রবেশ* । কলিকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০০৭।

ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় ইতিহাসে বৈদিক যুগ*। কলিকাতা: বেদবিদ্যাকেন্দ্র, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ (১৯৯৮)।

ভট্টাচার্য্য, বিমানচন্দ্র. (সম্পা.)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।* কলকাতা: জি.এস.পাবলিকেশন, ২০১৭.

ভট্টাচার্য্য, সুখময়। *মহাভারতের চরিতাবলী*। কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য্য, বিমানচন্দ্র। *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা।* কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৭।

ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ এবং তারকনাথ অধিকারী। *বৈদিক সংকলন* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪।

Chakravarti, Ranabir. *Exploring Early India*, Delhi: Macmillan, 2013 (2010). Maxmuller, F. *History of Ancient Sanskrit Literature.* London: Covent Garden, 1859. Print.

Raychaudhuri, Hemchandra. *Political History of Ancient India.* Kolkata: University of Calcutta, 1970(7th Edition).

Winternitz, M. *A History of Indian Literature.* vol. I Part-I. Calcutta: University of Calcutta, 1926. (3rd ed.)

.....